খেলার কথা





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : অভিজিৎ ব্যানার্জি

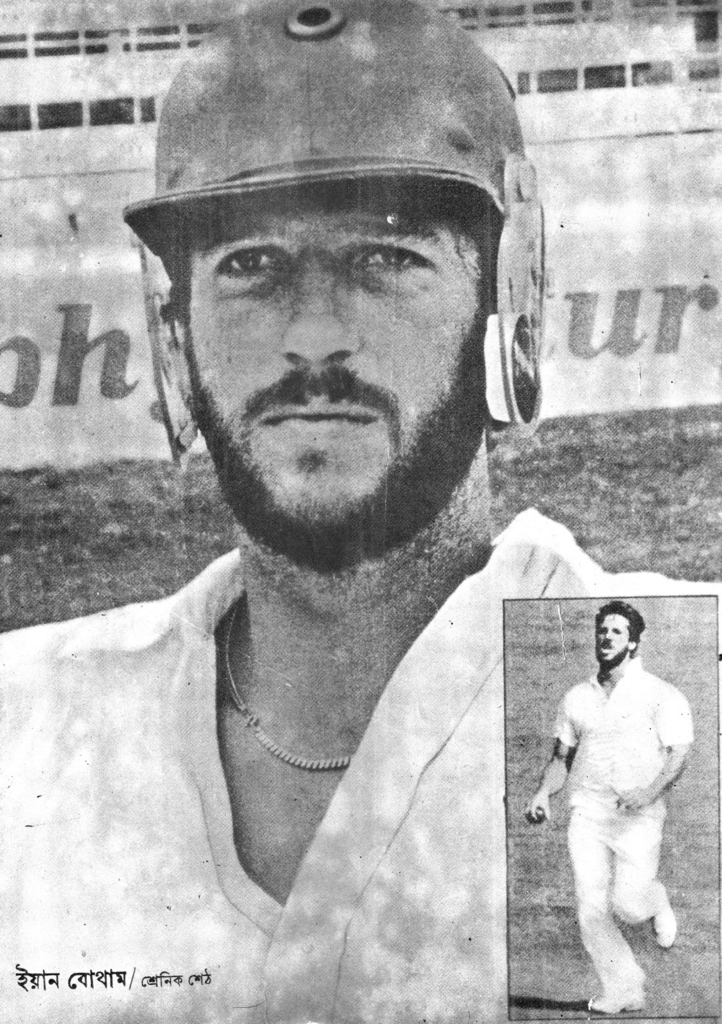
স্ক্যান : অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



ইয়ান বোথাম/ শ্রেনিক শেঠ

খেলার কথা

১৩ মার্চ ১৯৮০

সম্পাদক :
প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত

শিল্পী :
হরি মোহন বাগলি

সহযোগী শিল্পী :
সুশান্ত বন্দোপাধ্যায়

প্রচ্ছদের ছবি :
জয়ন্ত শেঠ

অন্যান্য ছবি :
জয়ন্ত শেঠ
স্পট নিউজ ফটো এজেন্সি
এবং সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

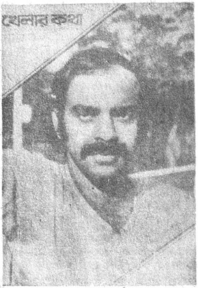
সম্পাদকীয় দপ্তর :
শান্তিনিকেতন বিল্ডিং
৮, কামাক ষ্ট্রীট, (টেনথ্ ফ্লোর)
কলিকাতা-৭০০০১৭

সার্কুলেশন দপ্তর :
৪৫এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

পূর্বাঞ্চলে বিমান মাশুল
প্রতি কপিতে ১৫ পয়সা।
অন্যত্র ২০ পয়সা।

এই সংখ্যায়





প্রি-অলিম্পিক, না—প্রি-ইলেকশান

ভারতীয় দল প্রি-অলিম্পিকের খেলায় সিঙ্গাপুর গেছে। দলের মোট সদস্য সংখ্যায় কুড়ি। সতের জন খেলোয়াড় তিনজন কর্মকর্তা। সামনের সারিতে পাঁচজন খেলোয়াড়—মানস, পায়াস, সাবির, বালচন্দ্রন ও নরেন্দ্র গুরুং। চানজনকে নিয়মিত খেলাতেই হবে, অতিরিক্ত থাকে একজন। এই একজনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে যে—আর একজনকে কি নিয়ে যাওয়া যেত না। নিশ্চয়ই নিয়ে যাওয়া তো যেতই এবং উচিত ও ছিল। জানিনা ক্যাম্পে 'বাসা • কোচিং করালেন অথচ যাবার সময় আর একজন কোচ এসে গেলেন জারনাল সিং। কোচের কি আহত হবার সম্ভাবনা আছে? যে বিকল্প কোচ সাথে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তাই নয় জারনাল কি রাতারাতি ভারতীয় দলের খেলার মাণ অনেক তুলে দেবেন বলে বিশ্বাস। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—মে মাসে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশানের নির্বাচন। বিজয়রঙ্গম তাই কোথায় কি ভাবে কাকে ম্যানেজ করা যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত। চুলোয় যাক প্রি-অলিম্পিক; আমি আগে ফেডারেশনে বাঁচি এইধরনের চিন্তাধারা নিয়েই এ দেশের ফুটবল। হায়! আমরা কি দেশে আছি। সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার।

কলিকাতা

প্রদীপ দা বনাম দিলীপ পালিত

১৬ ফেব্রুয়ারী 'খেলার কথায়' বিপ্লব দাশগুপ্তের লেখা পড়লাম। তিনি লিখছেন—দিলীপ পালিত বলছেন "প্রদীপদা ইস্টবেঙ্গলে গেলেও আমি যেতে পারি কারণ আমার তো কোন অভিযোগ নেই।" তবে কেন? মোহনবাগানে ১৯৭৯ সালে লীগ ও শীল্ড চলাকালীন প্রদীপদার সাথে দিলীপের মন কষাকষি হল? আমরাও ময়দানের সকলকে মিলে মিশে দেখতে চাই—সেটা দেখতেও ভাললাগে। দশরথ ভৌমিক।

বাঘাযতীন, কলিকাতা ৩২

ধন্য! রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে ভারতীয় ক্রিকেট দল কোন বিদেশী দলকে পরাজিত করলে ভারতের বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা ও সাথে কিছু কিছু মন্ত্রী খেলোয়াড়দের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে "এই জয় ভারতীয় ক্রিকেটের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরলো····· " "সারা পৃথিবী আজ তাকিয়ে রয়েছে, তোমাদের দিকে ···" "তোমাদের এই জয় দেশের জয়······"ইত্যাদি, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিশেষণ মিশ্রিত বাণী বর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু যখন ভারতীয় দল শোচনীয়—বা গৌরবান্বিত ভাবে পরাজয় বরণ করে, তথা থিত নেতারা বা মন্ত্রীরা তখন এই পরাজিত নায়কদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উৎসাহ দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। অর্থাৎ আমরা চিরকাল পাবার দিকে। আবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে তাদের দিকে নেই। শুধু আলোর দিনে আছি, অন্ধকারের দিনে নেই।

মলয় ও তাপস বাড়ুই

যাদপুর, কলিকাতা ৩২

পরিসংখ্যান ঠিক করে নিন

১৬ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় নীরব রায়ের ভারতীয় ক্রিকেটারদের শতরানের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে নট আউটের তারকাচিহ্নের ছাপ অনেকগুলিতে ছিল না। ক্রমিকানুসারে ১০, ১২, ২১, ২৫, ২৮, ৩৯, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ১০৯ এই নাম্বারে যে সমস্ত খেলোয়াড়ের নাম আছে তারা প্রত্যেকেই নট আউট ছিলেন।

নারায়ণ দাশগুপ্ত

দুর্গাপুর।

হকি'র গন্ধ পাচ্ছি না

হকি'র দলবদল শেষ হয়ে গেল, লীগ শুরু হয়ে গেল অথচ 'খেলার কথা' চুপচাপ। কোন দল কেমন হ'ল? কে কোন দলে গেল? এ সম্পর্কে আমরা প্রায় ঝাপসা অন্ধকারে। কারণ স্বল্প বিবরণীতে (সংবাদ পত্রে) সব জানা সম্ভব নয়। তাই আমরা আশা করেছিলাম এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবে 'খেলার কথা'। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমরা হকির ব্যাপারে যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। কিছুই জানতে পারলাম না। আশা করি আগামী সংখ্যাতে এই বিষয়ে সরব হবে 'খেলার কথা।'

মলয় ঘোষ।

নাগের বাজার, দমদম।

এগিয়ে আসুন

অতীতের বিখ্যাত ফুটবলার শ্রী নায়ার এখন গোবরা অঞ্চলের এক বস্তিতে থাকেন। অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। তাই অধমের বিনীত নিবেদন-- মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল এই দুটো দলের কর্ম কর্তারা এগিয়ে আসুন এই খেলোয়াড়ের জন্য। ভবিষ্যতে যে অর্থ এই খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে খরচ করবেন বা চোখের জল ফেলবেন সেটা বর্তমানেই হয়ে যাক। তাহলে এই ফুটবলার জীবনের বাকী দিনগুলিকে একটু ভালভাবে কাটিয়ে যেতে পারেন। সৌমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিভূতি ভূষণ ধাড়া। শিবপুর, হাওড়া—২।

একি ফলাফল

ধরা যাক গত বছরে ইংল্যাণ্ডের ওভাল টেস্ট থেকে। ভারত দারুণ খেলল, সাংবাদিক থেকে শুরু করে, ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন খেলোয়াড়েরা পর্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন ভারতীয় দলের। যাই হোক সিরিজ রেখে এলাম আমরা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে। তারপরই আমাদের দেশের মাটিতে লড়াই শুরু হল 'কিম হিউজের' অস্ট্রেলিয়া দলের সাথে এবার সিরিজ জিতলাম আমরা। অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজার মেরিম্যান বলে গেলেন "ভারত ভাল খেলেছে, তাই জিতেছে।" অধিনায়ক কিম হিউজ বললেন "বেগ পেতে হবে পাকিস্তানের কাছে।" আবার আমরা সিরিজ জিতলাম। তারপর পনেরো দিনের মাথায় ইংল্যাণ্ড দল অস্ট্রেলিয়া থেকে বাড়ী ফেরার পথে বোম্বাইতে একটা টেস্ট খেলে গেলেন। টেস্ট সব সময়েই টেস্টের টেম্পারমেণ্টে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয়নি ভারতীয় দল টেস্ট খেলছেন। জানি ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা তবুও তারপর দুটো সিরিজ জিতে, তাতেও অবাক লাগে যে আমরা ইংল্যাণ্ডের কাছে হারলাম শোচনীয়ভাবে। সম্রাট চ্যাটার্জী।

চিত্তরঞ্জন পার্ক, দিল্লী।

সাজেশান

চারিদিকে শুধু শুনছি বিদেশের মাটিতে খেলতে এসে ফিরে যাবার সময় অধিনায়ক দোষারোপ করছেন আম্পায়ারকে। অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দোষারোপ করছেন। ভারতের মাটিতে এসে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান দোষারোপ করছেন। সিকান্দার বখত ভারতে এসে স্টাম্পে লাথি মারছেন। মাইকেল হোল্ডিং নিউজীল্যাণ্ডে গিয়ে স্টাম্পে লাথি মারছেন। সকলেরই বিক্ষোভ ঐ সাদা জামা সাদা প্যাণ্ট মাথায় টুপি পরা ব্যক্তির উপর। তাই আমার সাজেশান দু আম্পায়ার দু দেশের হোক—যে দু দল পরস্পর খেলায় অংশ গ্রহণ করবে তাদের তরফের। ধ্রুব জ্যোতি রায়চৌধুরী।

কলিকাতা—২৬।

কথার কথা — বাক্য বাগীশ

চ্যাম্পিয়ানদের প্রসঙ্গে মহম্মদ আলি একবার বলেছিলেন: "চ্যাম্পিয়ানরা জিমন্যাসিয়ামে তৈরী হয় না। তৈরী হয়, তাদের ভিতরের গভীর একটা কিছুর দ্বারা—একটা আকাঙ্খা, একটা স্বপ্ন, একটা কল্পনা। তাদের থাকা চাই স্ট্যামিনা। তাদের হতে হবে আর একটু দ্রুত। তাদের থাকা চাই স্কিল এবং মনের জোর—তবে মনের জোরটা অবশ্যই বলশালী হওয়া চাই স্কিলের থেকে।"

এই শেষের বাক্যটিই আমার বারবার মনে পড়ে যখনই কোন ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লড়তে নামে: "মনের জোর অবশ্যই বলশালী হওয়া চাই স্কিলের থেকে।" সিঙ্গাপুরে প্রি-অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ছটি দলের মধ্যে ভারত পঞ্চম স্থানটি সংগ্রহ করতে পেরেছে। ভারতের নীচে রয়েছে শ্রীলঙ্কা যারা একটিও পয়েন্ট যোগাড় করতে পারেনি। যেকোন ভারতীয় ফুটবল দলে কলকাতা মাঠের খেলোয়াড়ই সংখ্যায় বেশি থাকে—কখনো কখনো অর্ধেকেরও বেশি। এবার সিঙ্গাপুরে রক্ষণ ও আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ছিল কলকাতার ছেলেরাই। ভারতীয় ফুটবল দলের সাফল্য বা ব্যর্থতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কলকাতার ফুটবল। এটা গত তিনদশক ধরেই হয়ে আসছে।

কলকাতা ফুটবল এখন কি চেহারায়? আই এফ এ নিয়ামক সংস্থা কিন্তু মান্ধাতা আমলের ছক থেকে বেরিয়ে এসে সময়োপযোগী আধুনিক ছকের মধ্যে ফুটবলকে রাখার ক্ষমতা তার নেই। চিন্তাও নেই। কলকাতা ফুটবলে "মনের জোর" দরকার হয় না, বরং সেটাকে দমিয়ে দেওয়ার বা নিশ্চিহ্ন করার মত সহায়ক সব ব্যবস্থাই রাখা আছে। কলকাতা প্রথম ডিভিশ্যন লীগে ক্লাবের সংখ্যা এখন যে অঙ্কে পৌছেছে তাতে কমপক্ষে সাড়ে চারশো ভাল ফুটবলার দরকার যদি "মনের জোর" দিয়ে খেলতে হয়। কিন্তু আমরা জানি ভাল ফুটবলার জনা কুড়ির বেশি কলকাতা ময়দানে নেই। এই মুষ্টিমেয়রা জানে, তাদের অনুগ্রহ ছাড়া অর্থবান তিনটি ক্লাবের গত্যন্তর নেই। এই মুষ্টিমেয়রা জানে, তারা টাকার জন্যই খেলছে এবং রাজ্য বা রাষ্ট্র তাদের টাকা দেয় না। তাদের দায়িত্ব ক্লাবকেই বিজয়ী করা, দেশকে নয়।

"ভিতরের গভীর একটা কিছুর দ্বারা" কলকাতা ফুটবলাররা পরিচালিত হয়না, যেহেতু ময়দানে গভীরতা নেই। এই গভীরতা না থাকার অন্যতম কারণ ক্লাব পরিচালকদের লোভ, নির্বুদ্ধিতা, ব্যক্তিত্ব-হীনতা, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। কোন তরুণ আকাঙ্খা, স্বপ্ন ও কল্পনা নিয়ে ময়দানে এলে, এক মরশুমের মধ্যেই সেগুলি শুকিয়ে ঝরিয়ে দেওয়ার জন্য সব মহল থেকেই চেষ্টা চলবে। এই ক্লাব পরিচালকদের প্রতিনিধিরাই জড়ো হন আই এফ এ তে।

বছরের পর পর বছর যে ছকের মধ্যে মানসিক গঠন অভ্যস্ততা পেয়ে গেছে, সেখান থেকে নিজেকে কয়েকদিনের মধ্যে টেনে তোলা বা বদলিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধুই স্কিল দিয়ে সফল হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ফুটবলারদের ঐতিহাসিক ঘাটতিতো শুধু মনেই নয়, দেহের ক্ষমতাতেও। স্ট্যামিনা এবং স্পীড আন্তর্জাতিক মাপে এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত হল না। আর স্বপ্ন এবং আকাঙ্খাতো কলকাতার ময়দান ছাড়িয়ে বড়জোর দিল্লি এবং বোম্বাই পর্যন্ত, এশিয়ার বা অন্যান্য মহাদেশের মাঠে পৌছনোর কথা ভাবতেই পারেনা। কিন্তু এতেই এরা খুশি এবং তৃপ্ত।

কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়ামান নীচু থেকে যাওয়ার জন্য শুধু খেলোয়াড়রাই কি দায়ী? সদ্য প্রকাশিত "রিচিং ফর একসেলেন্স" বইটিতে মেলভিল ডিমেলো (একদা আকাশবাণীর ক্রীড়া প্রযোজক ও ভাষ্যকার) গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের গলদ ও অসুস্থতাগুলিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে বলেছেন: "এখনো আমরা খেলার প্রধান ধমনীটির মুখ খুলে তাজা রক্ত তার মধ্যে পাম্প করে ঢোকাতে পারিনি। অনেকে ভাবেন হতাশ হবার মত অবস্থার কথা একটু তাড়াতাড়িই যেন বলা হচ্ছে, কিন্তু অনেকেই ভাবছেন, আশান্বিত হবার জন্য ইতিমধ্যেই বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেছে। এর সহজ কোন উত্তর নেই। আমাদের প্রধান লড়াই জড়ত্বের সঙ্গে। কাজ করার জন্য শুধুই কথা বলার বদলে কর্মকর্তাদের ঘুম ভাঙিয়ে কিভাবে তাদের কাজে নামান যায়? কিভাবে আমাদের খেলোয়াড়দের নখদন্ত সমেত আরো নিখুঁত করে তোলা যায়? আজ যারা আমাদের খেলার ভারপ্রাপ্ত, তাদের কাজ শুধু অজুহাত দেওয়ার। এবং এই কাঁচুমাচু ভঙ্গিটা তারা নেয়, প্রথম বলটি হওয়ার বা প্রথম বুলি-অফ হওয়ার আগেই, যে তিক্ত বটিকাটি অতঃপর সেবন করতে হবে তাতে মধু মাখিয়ে তৈরী হবার জন্যই যেন।"

সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আসা ভারতীয় ফুটবল দল তাহলে কি বলবে?



ভাঙ্গা-গড়া খেলা

বিপ্লব দাশগুপ্ত

সাবেক দল ছেড়ে কেউই চট্ করে নতুন কোথাও ঘর বাঁধতে চান না। আজকাল ময়দানে প্রায় প্রতিটি ফুটবলারই পুরনো দলে থেকে যেতে চান। নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন এই ভেবে অনেকেই চেষ্টা করেন পুরনো দলে থেকে যেতে।

কিন্তু পরিস্থিতির চাপে অনেক সময়েই দেখা যায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কিছু ফুটবলার দল-বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারুর কারুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্লাব তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কেউ কেউ হয়তো পুরনো তিক্ত স্মৃতির দিনগুলোকে ভুলতে পারে না। এই সময়ে তার মনে পড়ে যায় বিগত দিনের কথা। যে দিনগুলোতে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। তাই দলবদলের মুহূর্তে তার সঞ্চিত অভিমানে কিছুটা বিক্ষোভে ফেটে পরে। মনের দুঃখে, ক্ষোভে সে হয়তো কিছু উচিত কথা বলে ফেলে। তখনই হয় যতো গণ্ডোগোল। তার পরিণতি—অনিচ্ছাস্বত্বেও তাকে ক্লাব ছাড়তে হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সাবেক দলের চাইতে পাশের ক্লাব তাকে বেশি কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। সে তখন তার সেই পুরনো ক্লাবের কর্তাদের কাছে গিয়ে জানায়। "ওরা বলছে এবারে···টাকা দেবে। বারো আনা টাকা অ্যাডভান্স করবে। সেই সঙ্গে আমার ভাইকে একটা ভালো চাকরী দেবে। এখন আপনারাই ঠিক করুন কী করবেন।" পুরনো টীমের কর্তরা যদি এটাকে ভালো ভাবে গ্রহণ করে কিছু চেষ্টা করেন তাহলে অন্যকথা। নইলে কিন্তু ঐ খেলোয়াড়টিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়—অর্থাৎ দলবদল করতে হয়।

অনেকে আছেন, তাঁরা সবার আগে খোঁজ নেন যেখানে খেলবেন সেখানে তাঁর জায়গা নিরাপদ কিনা। অর্থাৎ যে মাঠে তার জায়গাতে এমন কেউ আছে কিনা যে নাকি তার খেলার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে। যদি এমন হয় তাহলে ঠকে গিয়েও অন্যত্র চলে যেতে পারেন। আবার যদি দেখেন যে তার জায়গা এখানে অনেক বেশি নিরাপদ তাহলে অপর শিবিরের শত প্রলোভনও তাকে টলাতে পারে না।

এখন বাঙ্গাল ঘটি বা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটা প্রায় উঠে যাচ্ছে। প্রতিটি ফুটবলারই এটাকে নিজের জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে হ্যাঁ সুযোগ-সুবিধের আকাশ পাতাল তফাৎ হলে কেউই বাঙ্গাল বলে ইস্টবেঙ্গলে থেকে যাননা বা ঘটি হলেই মোহনবাগানে নাম লেখান না।

দলবদল-এর অর্থ জার্সি বদল। তাঁবু বদল। প্রতিবছরই ফেব্রুবারী-মার্চ মাসে এই পালা কলকাতা শহরকে নাড়িয়ে দেয়। মহালয়ার শঙ্খধ্বনি চণ্ডীপাঠ যেমন মা দুর্গার আগমনবার্তাকে ঘোষনা করে ঠিক তেমনি দলবদলের মুহূর্তেই ময়দানে ফুটবলের পদধ্বনি শোনা যায়।

ক্লাব কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের কাছে নতুন কায়দায় হাজির হন। কারুকে বলেন 'ঘরের ছেলে, তুমি থাকবেনা এটা হতে পারে?' কারুকে বলেন, 'তোমাকে এবার উদ্যোগী হতে হবে। সামনের বারের পরের বার তুমি ক্যাপ্টেন। তাই এবার টীমকে মজবুত না করলে তোমার সময়ে ফল পাওয়া যাবেনা।' সেই সঙ্গে অগাধ টাকা, প্রয়োজনে অর্ধেক রাজত্ব রাজকন্যা দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলেন।

ফুটবলাররাও যেন এই দিনগুলোর জন্য প্রতিবছর অপেক্ষা করেন। তারাও যতটা সুবিধে আদায় করা যায় ততোটাই করে ছাড়েন। যেই আসুক না কেন প্রথম দিকে কারুকেই না বলেন না। নিজের ওজনকে যাচাই করে নেন। তারা চান তিনটে ক্লাব থেকে লোক বারে বারে আসুক। তাহলে তার গুরুত্ব বাড়বে। যেখানেই থাকুক না কেন সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাবে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। তবে অন্যদের তুলনায় সংখ্যা অনেক কম।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমরা দলবদলের সময়ে ঐ চিত্রটাই দেখে আসছি।

এবারের দলবদলের পালায় দলগঠনে সবার আগে নেমেছিল ইস্ট-বেঙ্গল। দার্জিলিং-এর গোল্ডকাপে অতি শোচনীয় ভাবে হেরে যাবার পরই ওরা একটা অংক কষেছিল যে কীভাবে আশির দশককে শুরু করা যায়। ব্যর্থতা, গ্লানি, বিবাদ, বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে ইস্টবেঙ্গলের দু একজন কর্মকর্তা চেয়েছিলেন মেরুদণ্ডহীন ক্লাবকে জোড়া লাগতে। নিভে পড়া মশালকে জ্বালিয়ে তুলতে। ওরা জানতেন ইস্টবেঙ্গল টীমে সবচেয়ে বড় গলদ নেতৃত্বে। গোটা টীমে এমন কেউ ছিলেন না যে নাকি খেলার মাঠে টীমকে নেতৃত্ব দির্তে পারেন। কথাটা ঠিক। গতবারের ইস্টবেঙ্গল টীমের হাল দেখে আমাদের দুঃখ হয়েছে বারে বারে সংশয় জেগেছে এই কী সত্তর দশকের ইস্টবেঙ্গল। কর্তৃপক্ষ গতবার সমরেশকে ছেড়ে যে বিরাট ভুল করেছিলেন তা পরে তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। এমনিতে যাই খেলুন না সমরেশ, টীমকে নেতৃত্ব দিতে তার তুলনা নেই। ওরু তাই অঙ্ক কষলেন যে সমরেশ, সুধীর, হাবিব এবং গৌতমদের মতো পোড় খাওয়া ফুটবলারদের আবার টীমে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই সঙ্গে চাই একজন দক্ষ কোচ। যিনি গোটা টীমে ডিসিপ্লিন আনতে



পারবেন। সত্যি বলতে গেল বার ইস্টবেঙ্গল টীমে কেউই কারুকে মানতনা। খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ ক-জন খেলার চাইতে বেশি অন্য ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। অফিসিয়ালরাও ছিলেন অপদার্থ। ফুটবলারদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ার চেষ্টাই করেন নি। তারা ভেবেছিলেন 'টাকা দিয়েছি ব্যস্। ট্রফি দিতে হবে।' কিন্তু এটা জানতেন না যে টাকা দিয়ে মাথা কেনা যায় কিন্তু মন পাওয়া যায়না। অর্থাৎ টাকা দিয়ে ফুটবলারকে মাঝে মাঝে ধরে রাখা যায় কিন্তু ট্রফি জেতা যায়না। তাই গতবার ইস্টবেঙ্গল টীম একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এমন একজন কোচ চাই যাকে সবাই মানবে। ওরা দার্জিলিং-এ বসেই পি কে-র সঙ্গে প্রাথমিক কথা চালালেন। পি. কে কিছু শর্ত রাখলেন। ওরা তাতে রাজী হলেন। এইভাবে আরও কিছু দিন কথা চলার পর ওরা যখন নিশ্চিত হলেন যে পি কে আসছেন তখন জোর কদমে নেবে পড়লেন টীমকে ঢেলে সাজাবার জন্যে।

আরব এবং বাহরিন সফরের পর ফুটবলারদের অনেকেই সন্তোষ ট্রফির জন্য ব্যস্ত থাকলেন। তারপর কলকাতা ফিরে মাত্র কিছুদিন কাটাবার পর বেশ কিছু ফুটবলার বাঙ্গালোরের ক্যাম্পে যোগদানের জন্য রওনা দিলেন।

তারই আগে ইস্টবেঙ্গল অফিসিয়ালরা খুব ঠাণ্ডা মাথায় এগোবার চেষ্টা করলেন। ওরা ঠিক করেছিলেন যে সুরজিত সেনগুপ্তকে কোন-মতে রাখবেন না। তবে তাকে এটা বুঝতে দেবেন না। হঠাৎই এমন একটা পরিস্থিতির সামনে ফেলবেন যে সুরজিত মাথা নত করে টীমে থাকবেন বা বাধ্য হয়ে অন্য কোথাও একাকী চলে যাবেন। তখন তাঁদের আশা ছিল যে তারা মানসকে পাবেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এবার রিক্রুটমেণ্টের দায়িত্ব পড়েছে অজয় শ্রীমানী এবং জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর উপরে। নীশিথ ঘোষ এদেরকে বলেই দিয়ে-ছিলেন, 'যেমন করে টীম করতে হবে। টাকার জন্য পিছু হটবেনা।' ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহাকে জানানো হল, যে তিনি টীম করতে দক্ষ নন। অতএব এখন যেন তিনি চুপ থাকেন।

জার্মান ম্যাচের দিন ক্লাবের লোকেরা একে একে হাত লাগালেন। সেদিন রাতে তারা মনোরঞ্জন-কে ধরলেন। আশ্বাস মিলল। এবার ভাস্করের পালা। ইস্টবেঙ্গল অফিসিয়ালরা এখানেও ফল পেলেন। ইতিমধ্যে সত্যজিতের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে। সে এবার ক্যাপ্টেন। অতএব না থাকার কোনো প্রশ্নই আসেনা।

হরজিন্দার এবং ডেভিড সম্পর্কে ক্লাবের কোনো সংশয় ছিলনা। তবে সাবির সম্পর্কে ক্লাব জানত যে সুরজিত ছাড়া সে নাও থাকতে পারে। ওরা তাই ঠিক করল সাবিরকে সুরজিতের ব্যাপারে কিছু জানাবেনা। সুরজিতকে রাখবে বা সুরজিত থাকছে এই বলেই সাবিরকে রাজী করাবে। সেইমতো বাঙ্গালোরে যখন ক্যাম্প চলছে তখন ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা গিয়ে বাঙ্গালোরে হাজির হলেন। কথা হল সাবিরের সঙ্গে। সব শুনে সাবির সম্মতি জানালেন। দেবরাজের সঙ্গে কথা হয়। তাকে জানানো হয় হরজিন্দার ছাড়া আর কোন পাঞ্জাবীকে টীমে রাখা হচ্ছেনা। ক্লাবের দু-জন খেলোয়াড়ও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। দেবরাজও তাদের না করতে পারেন নি। এদিকে চিন্ময় বাঙ্গালোরে গিয়ে ভাস্করকে বলে তার এত আগে কথা দেওয়া ঠিক হয়নি। এর উত্তরে ভাস্কর বলেন 'ঠিক আছে আমি আবার ভেবে দেখছি। আমি জানতাম তোরা থাকছিস্।'

এদিকে গৌতমের পিছনে ইস্টবেঙ্গল অফিসিয়ালরা দিনের পর দিন ধর্ণা দিতে থাকেন। কিন্তু সময় যত এগিয়ে আসে ওদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে 'গৌতম' আসছেনা।

শ্যামল ঘোষ কে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যতই 'গুড বয়' বলে সার্টিফিকেট দিননা, তাদের আচরণে কিন্তু শ্যামল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তার দরকার ফুরিয়েছে। তাই মনের দুঃখে শ্যামল ২২ তারিখ মহামেডানকে পাকা কথা দিয়ে দেন!

এক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে সুরজিত সেনগুপ্ত তার বন্ধু শ্যামলকে ফোনে জানান সে যেন তার সঙ্গে কথা না বলে কোন সিদ্ধান্ত না নেয়। ২১ তারিখ শ্যামল এবং সুরজিতে কথা হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী রহস্পাতে ইস্টবেঙ্গলের তরফে অজয় শ্রীমানীরা চিন্ময়ের বাড়ীতে যান। অনেকক্ষণ (বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন-টা) কথা হয়। উভয়েই বলেন সব ভেদাভেদ ভুলে যেতে। পাকা কথা হয়। কথা ছিল ১৮ তারিখ চিন্ময়ের নিকট আত্মীয় কালিদাস মুখার্জীকে তারা চিন্ময়ের বাবদ কিছু টাকা অ্যাডভান্স করবেন। তারা সেটা করেন নি। দেখতে দেখতে তিনদিন হয়ে যাবার পর চিন্ময়ের সন্দেহ হয় যে ক্লাব তাকে নিয়ে প্যাচ খেলছে। অর্থাৎ এমন একটা পরি-স্থিতির সামনে ওকে তারা ফেলে দেবেন যেখানে গিয়ে চিন্ময় অসহায় বোধ করবে। তাই চিন্ময় বিশ্বাস করতে পারেন নি। ও কিন্তু থাকতে চেয়েছিল। ১৯ তারিখ আমি ওর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেদিন চিন্ময় বলেছিল 'আমি ভাইস ক্যাপ্টেন। টীম ছাড়ব কেন? ওরা কথা দিয়েছে সব ভুলে যাবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম সুরজিত-দাকে যদি ওরা না রাখে বা অসম্মান করে? উত্তরে চিন্ময় জানায় 'তাহলে ভাবতে হবে।' কিছু পরে কালিদাস মুখার্জীকে ব্যাপারটা বললে তিনি বলেন। 'আমি সুরজিত, মানজিত বা সত্যজিত বুঝিনা। ক্লাব ভালো ব্যবহার করলে বাবন (চিন্ময়) থাকবে।' ভাস্কর বাঙ্গালোর যাবার আগে বারে বারে কালিদাসবাবুকে বলে যায় অ্যাডজাস্টমেন্টের চেষ্টা করবে। টীম ছাড়তে যেন না হয়।

কথা ছিল একুশ তারিখ ইস্টবেঙ্গল সুরজিতের বাড়ীতে যাবে। কিন্তু তার আগেই সুরজিত টের পান যে ইস্টবেঙ্গল আসবেনা। তাই সেও আসরে নেমে পড়ে। চিন্ময় যখন ঠিক করে টীম ছাড়বেই তখন সত্যজিত তাকে অনুরোধ করেছিল দু-চারদিন দেখতে। 'চিন্ময়' কিন্তু সেটাকে নিরাপদ মনে করেন নি। ক্লাব অবশ্য বলছে তারা ধরেই নিয়েছে সুরজিত থাকবেনা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লোকেরা খোয়াব দেখছিলেন। সুরজিতের সঙ্গে তাদের বৈঠক ফারাক্কা চুক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায় বৈঠকের আলোচনায় আসল প্রসঙ্গর চাইতে অন্য দিকে জোর বেশি দেওয়া হয়। তাই বৈঠক ব্যর্থ হয়। তারা কিন্তু জানতেন না যে নিজের টীমে সাড়ে পনেরো আনা ফুটবলারের উপর সুরজিতের প্রভাব কতোখানি। তাই তারা আগুন নিয়ে খেলা করেছেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল হতে না হতে চটপট্ অ্যাকসন শুরু হয়।

গেল গেল রব উঠল ইস্টবেঙ্গলে। গোড়া থেকেই তারা ভুল করে আসছেন। রিক্রুটমেন্টে নিয়ম হচ্ছে আগে জুনিয়রদের তুলে নিতে হয়। সে হিসেবে ইস্টবেঙ্গল যদি ফিলিপ, অনুদেব দাস বা বিশ্বজিত বোস, দেবাশিষ রায় এই ধরণের উঠতি ফুটবলারদের তুলে নিতে পারত তাহলে এতটা বেমানান হত না। তারপর টীমের অতি গুরুত্ব-পূর্ণ খেলোয়াড়দের যদি সব ব্যাপারে ফাইনাল করে নিত এবং ভালো ভাবে চলার প্রতিশ্রুতি দিত তাহলেও কিন্তু এই হায় হায় রব করতে হত না। যাকেই ফাইনাল করছে সেই দু-দিন পরে অন্য ক্যাম্পে পালিয়ে যাচ্ছে।



তবু বসে থাকলে চলবে না। ক্লাব তখন ঠিক করল যে তারা সিঙ্গাপুরে লোক পাঠাবে। যত টাকা লাগুক মানস, প্রসুন, পায়াসকে চাই। সেই সঙ্গে সাবির, ভাস্কর এবং মনোরঞ্জনকে রাখতেই হবে। মানসের সঙ্গে আগেও ক্লাব কথা বলেছিল কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। পারাস সম্পর্কে লোভ থাকলেও সাবির ডেভিড থাকছে ভেবে ওরা তেমন চেষ্টা করেনি। প্রসুন নাকি জানিয়েছিল সে আসতে পারে। তবে টীম ভালো করতে হবে। এদিকে ফিলিপের সঙ্গে ক্লাব আবার দেখা করল। ফিলিপ টের পেয়েছিল যে ইস্টবেঙ্গল গাড্ডায় পড়ে গেছে। সেও ছাড়বে কেন? সে একটা অবাস্তব টাকার অঙ্ক চেয়ে বসল। সঙ্গে বলল দীনকরকেও নিতে হবে। অতএব বিশেষ লাভ হল না। এদিকে হাফ ব্যাকে অমলরাজ অমলরাজ করে চেঁচিয়েও বিশেষ কিছু হয় নি। তাকেও নাকি মহামেডান সময়মতো তুলে নিয়েছেন। ক্লাব তখন পড়ি কি মরি করে সুভাষ রায়, তপন দাস, লতিফুদ্দিনকে ফাইনাল করে ফেলল। সেই সঙ্গে জুনিয়রদেরও টেনে নিল। দু-জনই খিদিরপুরের। একজন গোলকীপার দিলীপ পাল, অন্য জন লেফট উইং সোমনাথ

ব্যানার্জী। হাবিবের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। সুধীর কর্মকারও কথা দিয়েছিলেন তিনি আসবেন।

এদিকে সিঙ্গাপুর যাওয়া নিয়ে ক্লাব তৎপর হয়ে উঠল। পাশপোর্ট রেডি না থাকায় খানিকটা দেরিতে ইস্টবেঙ্গল টীমের লোকেরা ৫ই মার্চ সিঙ্গাপুরের পথে পাড়ি দিলেন।

ময়দানে জোর গুজব সুরজিত নাকি তার চারদিন আগে সিঙ্গাপুর চলে যান।

সত্যি মিথ্যে এখনো বলুতে পারছিনা। কারণ সুরজিতের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায়। তাকে জিজ্ঞেস না করে আমি নিশ্চিত হতে পারছিনা যে তিনি সত্যি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন কিনা? তা গিয়ে থাকলেও মহামেডান টীমের হয়ে গেছেন কিনা! আমার মনে হয় তিনি যাননি। কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে মনে হয় তিনি ভুল করেছেন। খেলার মাঠের অন্যায় খেলে দেখালেই মনে হয় ভালো হত। দল ভাঙাভাঙির নোংরা খেলাতে তার মতো মানুষকে মানায় না। অনেকেই বলেছেন না, না। এ হতে পারেনা। সুরজিত একাজ করতে পারেনা। আমারও তাই মনে হয়। সুরজিতের যখন কনফিডেন্স আছে যে খেলোয়াড়রা তার সাথে আসবে তখন তার উপযাজক হয়ে তাদের কাছে না গেলেও চলতো।

কে যেন বলছিলেন। 'টীম ভাঙার জন্যে সুরজিত যে পরিশ্রম করছে এটা যদি কোনদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে করত তাহলে মনে হয় টীমের আজ এই হাল হতনা। বা যে উদ্যমটা মহামেডান টীম গড়তে দেখাচ্ছেন সেই উদ্যমে যদি ইস্টবেঙ্গল টীমের ছেলেদের খেলার মাঠে এককাট্টা করতে পারতেন তাহলেও বোধ হয় টীমের আজ এ হাল হতনা।'

—এই সব কথাগুলো শুনতে আমার ভালো লাগছে না। আমি কিন্তু এখনো মানতে পারছি না যে সুরজিৎ এসব কাজ করছেন। আমার মনে হয় তিনি যদি সিঙ্গাপুর যেয়ে থাকেন তাহলে খেলা দেখতে গেছেন।

এদিকে মিহির বোস মহামেডানকে একটু নাচিয়ে আবার পালিয়ে যান। আবার মোহনবাগানের সঙ্গে কথা চালাচালি হয়। ইস্টবেঙ্গলকে তখন সত্যজিৎ মিহিরের ব্যাপারে আর একবার ভাবতে বলেন। ক্লাব ২৬ তারিখ নাগাদ জানায় তারা মিহিরকে রাখবেন। কিন্তু ২৭ তারিখ সত্যজিৎ অফিসে এসে দেখেন যে মিহির নেই। সে মোহনবাগানের ঘরে ঢুকে গেছে। কিছুদিন পর ছাড়পত্রের তারিখ পিছোতেই মিহির আবার ফিরে আসে। সত্যজিৎ সব খুলে বললে মিহির নাকি কথা দেয় সে থাকবে। সেইমতো সে টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে নিয়ে নেয়। ৮ই মার্চ সকালে ময়দানের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাকে জানান। 'আজ মিহির আবার মোহনবাগানের হয়ে পালাবে। ইস্টবেঙ্গলের গত বারের পাওনা টাকা কেটে বাকীটা ফেরৎ দিয়ে দেবে।' ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অফিসে সাড়ে এগারোটায় পৌছে দেখি হতাশ সত্যজিৎ।

ইস্টবেঙ্গল টীমের চিত্রটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে। কোন বাঁধন নেই। কেউ কারুকে মানে না। এ সময়ে জে-পি-র মতো রিক্রুটমেণ্ট অফিসার-রা থাকলে টীমের এ দশা হত না। এরই ফাঁকে ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান থেকে সমর ভট্টাচার্যকে ৯ই মার্চ তুলে নিয়েছে।

দল গঠনে এবার সবশেষে নেমেছে মহামেডান। এবং খুব ভালো-ভাবে। এত সুন্দরভাবে ওরা কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে যার প্রশংসা না করে পারছি না। সাবিরের কাছে ওরা প্রথমে অ্যাপ্রোচ করতেই—সাবির জানায়, 'সুরজিতকে ধরুন। নইলে হবে না।' মহামেডান সেই মতো এগিয়ে এত সব কাণ্ড ঘটিয়ে দিচ্ছে। ওদের চ্যালেঞ্জ ভাস্কর, সাবির তো আসছেই। মনোরঞ্জনও না এসে পারবেনা।, মহমেডান যেভাবে টীম গুছিয়েছে তার সঙ্গে যদি অমলরাজ এবং ফিলিপকে রেখে দিতে পারেন এবং ঐ তিনজনকে তুলতে পারেন তাহলে দল সামনের বার অনেক কাণ্ড ঘটিয়ে খেলবে। অশোক চক্রবর্তীকে মহামেডান রাখতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না অশোকও তদ্বির করছে না, ক্লাব তাই রমেন ভট্টাচার্যকে নিতে পারে। যদিও ইস্টবেঙ্গল তাকে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রমেন নিজের জায়গা নিশ্চিত না জেনে কোথাও যেতে চাচ্ছে না। লতিফুদ্দিন নাকি বলেছিল যে তার ভাই সুজাতকেও রাখতে হবে। মহামেডান তরফে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মহামেডান তরফে খবর আছে সিঙ্গাপুরে তারা সফল হয়েছে। তরফ আবার ইস্টবেঙ্গল থেকে টেলিগ্রাম এসেছে: 'দুঃখিত। কলকাতার খেলোয়াড় তুলুন।'

দল ভাঙা-ভাঙির লড়াইএ মহামেডান ইস্টবেঙ্গলকে টেক্কা দিলেন মোহনবাগানকে তারা কোন ঘা দিতে পারেনি। মোহনবাগান অফিসাররা ডুরাণ্ড কাপের পর থেকেই গন্ধ পেয়েছিলেন যে ময়দানে এবার টাকার খেলা চলবে, টীমের সাফল্যকে মূলধন করে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ওরা কথা বলে রাখলেও লক্ষ্য ছিল পুরনোদের ধরে রাখা। ওরা সে কাজে সফল হয়েছেন। মোহনবাগান অফিসাররা জানেন কীভাবে খেলোয়াড়ের মন জয় করা যায়। তাই ইস্টবেঙ্গল থেকে বড় টাকার প্রলোভনও কিছুতে মানস, পায়াস, বিদেশকে টলাতে পারল না। এই-খানেই মোহনবাগানের কৃতিত্ব। পুরনো শক্তিকে মজবুত করতে ওরা বাড়তি দু-জনকে পেয়ে যাচ্ছে। তারা হলেন মিহির বোস এবং ফ্রান্সিস ডি সুজা। ডামা ঢোলের বাজারে এর মধ্যে যদি মনোরঞ্জনও ঢুকে পড়ে অবাক হবার কারণ থাকবেনা। ক্লাবের লোকেরা প্রসূন যদি না থাকে সেই কারণে মিহিরকেও তুলে নিলেন। দরকার হলে মিহির হাফে খেলবেন।

প্রতাপ থেকে শুরু করে বিদেশ পর্যন্ত মোহনবাগানের কোন ভয় নেই। আর নেই বলেই ওদের সিঙ্গাপুরে লোক পাঠাতে হয়নি। দিলীপ পালিত থেকে যাচ্ছেন। রঞ্জিত মুখার্জী এবং শ্যামকেও ক্লাব থেকে যেতে বলেছে। শ্যাম মনে হয় মোহনবাগানে থাকবেনা। মিহির আসছে শুনলেই ও ইস্টবেঙ্গলে চলে যাবে। রঞ্জিত ও তেমন কিছু করতে পারে বেচারী রঞ্জিত। গতবার ওকে ইস্টবেঙ্গল বাতিল করে। আদর করে জায়গা দেয় মোহনবাগান। ও কিন্তু প্রতিদানে এখনো কিছু দিতে পারেনি। তবে সে সুযোগ যদি ও না পায় তাহলে হয়তো ও ইস্টবেঙ্গলে চলে যাবে। রঞ্জিত আমায় জানিয়েছে। ওসব ভুলে গেছি। ময়দানে খারাপ ব্যবহার পাওয়াটাই সম্বাভিবিক। জানো সেদিন একজনও আমার হয়ে প্রতিবাদ করেনি।

বাকী রইলো তপনদাস এবং স্বপন নন্দী। তপন সম্পর্কে ক্লাব আগ্রহ দেখাননি। স্বপন থেকে যেতে পারে।

ঠিক এই মুহূর্তে তরুণ বোস এবং সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা বলেছি। দু-জনেই সব দেখে হাসছেন। দু-জনই ফুটবল মাঠে দাপটের ছড়ি ঘুরিয়েছেন। তরুন তো নিজে জায়গা ছেড়ে যেন ক'জন গোল কীপারকে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। নিজে আজীবন ঠকেও কখনো মুখ খোলেন নি। অন্যে ঠকলেই তরুণ রেগে যেতেন। নিজে টিকিট না পেলে কী হবে টীমে যদি কোন তরুণ ফুটবলারকে ক্লাব বঞ্চিত করত তাহলে তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এ ধরনের নেতা হতে আর কাউকে দেখিনি। সকলেই নিজের স্বার্থে ঘা পড়লে লাফিয়ে পড়েন। তরুণ তাদের ব্যতিক্রম। শুধু বললেন, 'কারুর কাজে তো লাগাছিনা তাই ও নিয়ে ভাবছিনা। ব্যস।'

সুভাষ ভৌমিকও ময়দানে যে ক-বছর খেলে গেছেন অন্যায়ের প্রতি-বাদ মাঠে খেলে করেছেন। কারুর কাছে নালিশ জানাননি। মাঠে নেমে গোল করে বারে বারে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। গত দশ বছরে এই প্রথম দলবদলের দিনে তাকে একটু সহজভাবে পেলাম। এ নিয়ে কোন চিন্তাই তার নেই। আর খেলার ইচ্ছে নেই সুভাষের। অনেক কথা বলেছেন। তবে সেটা জানানো ঠিক হবে না।

ভাঙা-গড়ার খেলাটা বেশ জমেছে। এখন ভালোয় ভালোয় শেষ হলে হয়।

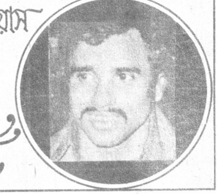
সুধীর বলছি

পাঠকের কাছে আমাদের এক বিশেষ ঘোষণা—আগামী সংখ্যা থেকে 'সুধীর বলছি'—এই শিরোনামায়, ভারতীয়-ফুটবলে, চিরস্মরণীয় এক নাম সুধীর কর্মকারের আত্মজীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

এ স্মরণীয় আত্মজীবনীর অনুলেখনে সুধীরের হয়ে যিনি কলম ধরেছেন তিনি হলেন আজকের বাঙলা তথা ভারতীয়-ফুটবল জগতে এক সাড়া জাগানো নাম—অমল দত্ত।

আপনাদের জন্য আমাদের প্রয়াস

"আগামী সংখ্যা থেকে আপনাদের প্রিয় 'খেলার কথা' তে পাচ্ছেন আপনাদের প্রিয়তম খেলোয়াড় সুধীর কর্মকারের আত্মজীবনী—"



সুধীর বলছি

এ কাহিনী, সুধীর কর্মকারের নিজেরই কাহিনী। নিজেরই মুখে বলা।

ব্যাংচিতা, সুপুরি, আম আর কাঁঠাল গাছ দিয়ে ঘেরা খিদড়ার এক প্রশস্ত বাড়ীর দোতলার ঘরে বসে, প্রতিরাতে একটু একটু করে আস্বাদ নেওয়া সেই বীরত্ব-গাথা যা ইস্ট-বেঙ্গল, বাংলা কিংবা ভারতীয়-ফুটবলকে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত করার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরকেও এক প্রবাদ-পুরুষে, রূপান্তরিত করে তুলেছিল।

আবার কখনও বা ঝোড়ো হাওয়ায় লোড-শেডিং-এর জন্য জেলে দেওয়া হারিকেনের কাঁপা আলোয় দেখেছি, বঞ্চনা আর ক্ষোভের কথা বলতে গিয়ে, লাজুক সুধীরের মুখ কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। কলমের খাপ ভরতে ভরতে, নিথর সেই মুহূর্তকে কোনোরকম আঘাত করতে না চেয়ে, মৃদুস্বরে বলেছি—আজ এই পর্য্যন্তই থাক সুধীর!

আসলে এ কাহিনী একটা উদ্বাস্ত ছেলের ছিন্নমূল জীবনে, শুকনো ভাবের খোলা কিংবা কাগজে পাকানো বল দিয়ে, উত্তর কলকাতার কানা গলিতে খেলোয়াড়ী-জীবন যার সুরু আর ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে, ভারতীয়-ফুটবলের ইতিহাসে 'চিরস্মরণীয় নাম'-এ যার পরিণতি—সে রোমান্টিক কাহিনী সত্যি-কারের ফুটবল-রসিকদের অবশ্যই পড়বার মত।

এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয়—জীব জগতে একমাত্র মানুষই, প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করতে পারে। আর নদীর স্রোতের মতই, প্রতিভাধর মানুষের কাছে, প্রতিকূল অবস্থাগুলো তার প্রতিভাস্ফূরণে দ্বিগুণভাবে উদ্দীপিত করে থাকে।

এ কথা সত্য না হলে, সুধীর কর্মকারের বকলমে এ লেখা লেখবার তো আমার দরকারই পড়ত না।

প্রথমে অবশ্য এ লেখা আমি লিখতেও চাই নি—তাই 'খেলার কথা'র তরফ থেকে বিপ্লব যখন আমায় অনুরোধ করল, তখন বলেছিলাম—কেন সুধীর নিজেই লিখুক না?

উত্তরে বিপ্লব বলেছিল—ভালো খেলোয়াড় হলেই কি লেখক হওয়া যায়? তাছাড়া সদ্য প্রকাশিত আর এক প্রসিদ্ধ ফুটবলারের আত্ম-জীবনীর কথাটা স্মরণ করুন যেটা আত্মজীবনী হলেও হতে পারে—কিন্তু সাহিত্য হয়ে উঠেছে বলে আমি অন্তত মনে করি না।

সেই মুহূর্তে ফেরেঙ্ক পুসকাসের আত্মজীবনী 'ক্যাপ্টেন অব্ হাঙ্গারি' বইটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। লণ্ডনে, ফয়েলসের দোকান থেকে কিনে—ঐ ফুটপাথে দাঁড়িয়েই, বইটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করেছিলাম। পরে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যখন জানালেন যে ঐ বইটি 'হার্য়ার্ড পেন' (অনুলেখক) এ লেখা, তখন পুসকাসের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আশাহত হলেও, ঐ সিষ্টেমটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হারায় নি।

সে শ্রদ্ধার ফলশ্রুতির বিচার, আমি আমার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

দেয়ার ওয়ে টু দ্য টপ

একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে।

একদিন সবেমাত্র ট্রেনিং শেষ করেছি; ইয়াসিন আমাকে বলল—'আরও কয়েকটা বল আমার দিকে মারুন!'

ঠিক তখন একজন এসে খবর দিল ক্লাবের চেয়ারম্যান নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

ইয়াসিন মিনতি করে বলল—'কিন্তু আমার ব্যাপারটা……'

আমি বললাম—'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো। তুমি ততক্ষণ নিজে প্র্যাকটিস করো।'

চেয়ারম্যান আমাকে একটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা জানালেন এবং সেটা মেটাতে মেটাতে ইয়াসিনের কথা ভুলেই গেলাম।

কাজ শেষ করে গায়ে কোট চাপাচ্ছি এমন সময় কে যেন বলল—'লেভ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে মনে আছে?' 'আমি তো ঘণ্টা তিনেক আগে এসেছি। তোমরা কি বলতে চাও ও এখনো আমার জন্য অপেক্ষা করছে? ইয়ার্কি?'

'আমরাও ওকে তাই বলেছি। কিন্তু ও শুনল না।'

তাড়াতাড়ি ট্র্যাক স্যুট চাপিয়ে মাঠে গিয়ে দেখি লেভ নির্বিকারভাবে গোলে বল মেরে যাচ্ছে। যেন কিছুই হয় নি।

জিজ্ঞেস করলাম—'টায়ার্ড লাগছে না?'

'না।'

'দুঃখিত। একটু আটকে গেছিলাম।'

'আমি জানি। ওরা বলছিল আপনি নাকি আসবেন না। অদ্ভুত লোক সব……।'

উদ্ধৃত গল্পটি বলেছেন রাজার রাজা গোলকীপার লেভ ইয়াসিনের প্রশিক্ষক।

আপাতঃ কৌতুকের অন্তরে যে অধ্যবসায় ও শ্রমনিষ্ঠতার প্রমাণ প্রচ্ছন্ন তা অনায়াসে অনুভূতিকে স্পর্শ করে যায়।

কেবল লেভ ইয়াসিন নন; বিশ্ব-ক্রিড়াঙ্গনের মোট চোদ্দজন শ্রেষ্ঠ সারির ক্রীড়াবিদ—যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুশ-ক্রীড়াধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের শ্রম, নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের আখ্যানে সম্বলিত হয়ে 'দেয়ার ওয়ে টু দ্য টপ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোক্তা-দ্বাবিংশতিতম অলিম্পিক আয়োজক কর্তৃপক্ষ। প্রকাশক-প্রগতি প্রকাশন। সাম্প্রতিক অতীতের ক্রীড়া তারকারা যেমন, তেমনি সুদূর অতীতের কিংবদন্তীর নায়ক-নায়িকারা এ গ্রন্থে অদ্ভুত-ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। লেভ ইয়াসিন, ভ্যালেরি ক্রমেল, নেলী কিম বা ওলগা মরজো-ভার কাহিনীতে যে স্বাভাবিক প্রাণ চাঞ্চল্য, ইতিহাসের পাতার কুস্তিগীর ইভান পদ্দুনি বা দৌড়বিদ জ্নামেনস্কি ভাইদের কাহিনী-তেও সে সজীব স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছে। নস্টালজিক অনুষঙ্গ কোন কাহিনীকে কোন-ভাবে ভারাক্রান্ত করে নি।

প্রসঙ্গ নির্বাচনে, প্রবন্ধ সংকলনে এবং কাহিনীগত পারম্পর্য্য রক্ষায় কর্তৃপক্ষের সযত্ন দৃষ্টিপাত গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে। প্রয়োজন মত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি ভাষার সহজিয়া ভঙ্গী গ্রন্থটিকে সাফল্যের সম্পূর্ণতা দান করেছে। ২১৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির মনোরম প্রচ্ছদ, ১৬৮টি চিত্র ও ঝকঝকে ছাপার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মরমীয়া নিবেদন বাণী সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

দেয়ার ওয়ে টু দ্য টপ: স্টোরিস এ্যাবাউট স্পোর্টসম্যান। প্রগতি প্রকাশন। মস্কো। দাম—৬·২৫।

সুরজিতের এপিঠ—ওপিঠ

অলরাউণ্ডার—ইস্টবেঙ্গল টীমের প্রতি ওর কোনও মমত্ব নেই। থাকলে এভাবে দল-বেঁধে দল ত্যাগের ঘটনা ঘটতো না।

স্ট্রাইকার—ক্লাবের সঙ্গে তার আত্মীয়তা দেনা পাওনার উপর দাঁড়িয়ে। উল্টোভাবে যদি সুরজিত প্রশ্ন রাখে, সে খারাপ খেললে ক্লাব কী তাকে আদর করতো। ভাল খেলা সত্ত্বেও ক্লাব তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চায়নি। প্রথম থেকে ভাল খেলোয়াড়ের গুণটাকে মেনে নিয়ে ক্লাব কর্মকর্তাদের উচিত ছিল সুরজিতের সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে তোলা। তা না করে এবারে ওদের প্ল্যান ছিল প্রয়োজনীয় প্লেয়ারদের রেখে শেষমেষ সুরজিতকে বাতিলের নোটিশ ধরানো। এটা সুরজিত জানতে পেরে ভীষণ মুষড়ে পড়ে। ভাল প্লেয়ারের গুণগ্রাহী হিসাবে ওই অপমানের খাঁড়া নেমে আসার আগেই অন্তরঙ্গ সুরজিতের সঙ্গী হিসাবে কর্মকর্তাদের শিক্ষা দিতে ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অন্যায় কোথায়? তবে সুরজিতের দোষ-গুণ খুঁজতে তার মাঠের ভূমিকাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করা উচিত।

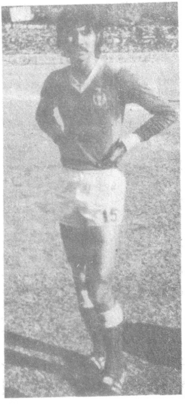
অল—সেদিক থেকে বহুপ্রচারিত বিরাট-ফুটবলার হিসাবে কখনই ওকে মানিতে রাজি নই। সারা ম্যাচে সে খেলার খেলা খেলে ৫/৬ মিনিট। বাকি টুকুতে সুরজিত দর্শকমাত্র। এই মূলধনে তাকে টপ প্লেয়ার হিসাবে চিহ্নিত করে না।

স্ট্রাঃ—এত কম সময় সে খেলায় থাকে এ-কথাটা আদৌ সত্যি নয়। যতদূর জানি, সামাদের মত প্লেয়ারও সব সময় খেলায় থাকতো না। একটা বিশেষ সময়ে প্রচণ্ড রকম জেগে উঠে-সামাদ অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটাতো+ একই ভাবে সুরজিত কন্দি হিসাবে, সারা গেমে সব সময়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে না খেলে অবরে সবরে নিজের চূড়ান্ত ক্ষমতায় ফেটে পড়ার আশ্রয় নিলে দোষ কোথায়। আর এভাবে খেলেই সে দলে অপরিহার্য হয়ে আছে। সেই ৭৩ থেকে ইস্টবেঙ্গল টীমে সুরজিত খেলছে। এর মধ্যে কত না স্ট্রাইকার উইঙ্গার ওর পাশে খেলে। কিন্তু দলের প্রতি এতটা "অপরিহার্য" হয়ে ওঠা কারও পক্ষেই দক্ষতার দিক থেকে দেখানো সম্ভব হয়নি। ওর পরিবর্ত উইঙ্গার অন্য দুই বড় টিমেও তো চোখে পড়ে না।

অল—মাঠের মধ্যে ওর গ্যালারি চমকানো (শোম্যানশিপ) ব্যবহার বড় দৃষ্টিকটু লাগে। যদি সে ভাল প্লেয়ারই হয় তবে তার এমন ব্যবহার কেন?



সুরজিতের প্রিয়-ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ছাড়া নিয়ে ময়দানে তখন একটা দমকা বাতাস চারিদিকে দাপাচ্ছে। এরই কিছু হলকা 'খেলার-কথা'র সম্পাদকীয় দফতরকেও ঢুকে পড়েছিল। ঘরোয়া পরিবেশ ভেবেই দুই সাংবাদিক স্ট্রাই-কার ও অলরাউনডার প্রাণ-খোলা আলোচনায় মেতে ওঠেন। সম্পাদকের চেয়ার থেকে আমি তখন স্কুপ সংগ্রহে চুপি চুপি মগ্ন। খবর খুঁজিয়ের এমন ঘনিষ্ঠ দ্বন্দ্ব সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবস্থা করলেও মনোমত হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে টেবিল চাপড়ানিও ছিল। একে অপরের সম্বোধনে যেন আজি-আজি ভাব। যুক্তির খাতিরে স্ট্রাইকার দেখতে দেখতে স্টপার বনে গেলেন। অল-রাউণ্ডার তুণে তুণে স্ট্রাইকারকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। বাক্ যুদ্ধের ক্ষান্তি হল তখনই যখন টের পেলো ওরা যে তাদের সুরজিত সমীক্ষা টেপড হয়ে গেছে।



স্ট্রাঃ—এই প্রসঙ্গে বেশী দূর যেতে হবে না। ময়দানের কিছুদিন আগের হিরো চুনী গোস্বামী কি এমন সব কাণ্ডকারখানায় মাতা-মাতি করে নি। প্রথম দিকে গ্যালারি এসব ব্যবহার তেমন গ্রাহ্য করতো না। পরে তারাই এ নিয়ে বিদ্রুপ করেছে। এই উদাহরণ দিয়ে সুরজিতের শো-ম্যানশিপকে আমি মেনে নিচ্ছি বললে ভুল হবে। আমার কথা, এই শো-ম্যান-শিপ একজন দোষগুণ মাখানো ফুটবলারের আচরণের একটা দিক। এজন্য খামোখা সুরজিতকে দোষী করা ভুল হবে। এ দৃষ্টান্ত অন্য নামী প্লেয়ারের মধ্যেও ছিল এবং আছেও।

অল—এখন দেশের অন্যত্র ফুটবলারদের মধ্যে সুরজিতের খেলাকে দারুণ কিছু ভাবার দিন চলে গেছে। একইভাবে বড় টীমের ডিফেণ্ডাররাও কলকাতার মাঠে সুরজিতকে তোয়াক্কা করে না।

স্ট্রাঃ—যুক্তিগুলো আদৌ ঘাড় পেতে মেনে নিতে মন সায় দেয় না। দিল্লি মাঠে পাঞ্জাবী-দের কলকাতার ফুটবলাররা দারুণ ভয় করে। ইদানীংকালে দিল্লীর মাঠে কলকাতার সবচেয়ে ধারাল ও সফল ফরোয়ার্ড সুরজিত। মনে পড়ে, গত বছর লীগে কোচ পি কে ছুটন্ত উইং-ম্যান বিদেশকে নাছোড়=জোঁকের মত সুরজিতের পিছনে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ওকে বড় টিমের ডিফেন্ডাররা ভয় পায় না, এ কথাটা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, ওর খেলার ধাঁচ বড় টিমের প্লেয়ারদের মুখস্থ।

অল—আসলে সুরজিতের প্রকৃতিতে ফুট-বলারের টাফনেশ নেই। অহমিকায় ছোট লাগলেই সে বিশ্রীরকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখন মনের ভারসাম্য হারায়। রেফারির প্রতি সুরজিতের আচরণ খারাপ হয়। এ সবগুলো ঢাকতে সে অদ্ভুত অজুহাতের আশ্রয় নেয়।

স্ট্রাঃ—সুরজিতের ছিপছিপে সাধারণ বাঙালীর চেহারা, একটু রোমান্টিক আদল ইত্যাদি সব মিলিয়ে ওকে মাঠের বাইরে একটু ডাকাবুকো ফুটবলারের মত নাও লাগতে পারে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী গুণাবলী তো আজকের ফুটবলারেরই অঙ্গ। বিশেষত দামী ফুটবলারদের। শুধু দামী ফুটবলার কেন নাসতাসে, ইয়ান চ্যাপেলরাও তো তাদের অহমিকা আগলাতে দারুণ টনটনে। আর রেফারির প্রতি শতকরা নিরানব্বই জন ফুট-বলারের মাঠের মধ্যে সহজাত ক্রোধ থাকে। যতদূর জানি, সুরজিত এক সময় বার বার রেফারীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। এখন সে অনেকটা মৃত।

অল—মাপ জোখ করলে ওর দক্ষতা আর সুপারস্টারের ভরণে অঢেল পার্থক্য চোখে পড়বে। আসলে ও যতটা খেলে তার অনেক বেশি সুপারস্টার হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে চায়।

স্ট্রাঃ—এখন মনে হয় সুরজিতের সমান দক্ষতায় ফুটবলার প্লেয়ার কলকাতার মাঠে নেই। এই অভাবেই হয়ত সুরজিত জো পেয়েছে নিজেকে কেউকেটা হিসাবে জাহির করার।

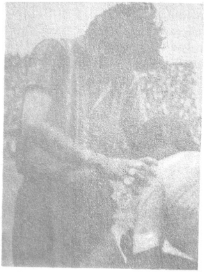
অল—এই বেশি মাত্রায় সুপারস্টারের আত্মসচেতনতা মাঝে মাঝে সুরজিতের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। দু-বছর আগে উয়াড়ির বিরুদ্ধে লীগ ম্যাচ শুরুর আগে নিজের বন্ধু-বান্ধবকে মাঠে ঢোকাতে গিয়ে সে ফাঁপরে পরে। সেদিন তার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। ইস্টবেঙ্গল হেরে যায়। এই রকম ছুটকো ছাটকা ঘটনায় জড়িয়ে সুরজিত কী প্রমাণ করতে চায় না যে সুপার=স্টার সুরজিতকে সকলকেই সব জায়গায় কুর্নিশ করতে হবে। এমন কি নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার অভিভাবক পুলিশকেও। সেদিন মাঠে ঢুকতে গিয়ে ঘটনা ঘটেছিল পুলিশের সঙ্গেই।

স্ট্রাঃ—ঘটনাটিতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে সুরাজতের মনে আত্মসচেতনতার মেদ জমেছে। তবে সেদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক খবর নিলে হয় তো দেখা যাবে যে, প্লেয়ারদের জন্য বরাদ্দ ডে-স্লিপ সেদিন সুরজিত পায়নি। আর খেলার দিন সুরজিতকে যাতে এ ধরণের ঘটনায় জড়াতে না হয়, তারজন্য ক্লাব কর্মকর্তারা কী করেছেন সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। টুকরো টাকরা ঘটনা নিয়ে প্লেয়ারের উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

অল—সুরজিতের গর্বিত আচার-আচরণ অনুশীলনের মাঠেও বারবার চোখে পড়ে। সব সময়ই সে নিজেকে আলাদা রাখতে ব্যস্ত। মিলেমিশে প্রশিক্ষণে মেতে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হয় না। আর কোচ হিসেবে সে পি. কে ছাড়া অন্য কাউকে মানতে রাজি নয়।

স্ট্রাঃ—সুরজিত সম্বন্ধে এই অভিযোগকেও একপেশে লাগছে। অন্যদের প্রতি তার অবজ্ঞাকে কেউই সহ্য করবে না। কিন্তু অন্য দিকে সুরজিত ভেবে থাকে, তার সঙ্গী প্লেয়ার-রাও তার মতনই মেধাবী হবে। হরেক ক্ষেত্রে সে না হওয়ায় হয়তো সুরজিত বিরক্ত হয়। এবং বিরক্তিই তার মধ্যে আলাদা থাকার ভাবটা জাগিয়ে তোলে। আর সব কোচই সব প্লেয়ারের কাছে নমস্য হবে, এটা ঠিক নয়। এও তো হতে পারে যে সুরজিতের উচ্চ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে অন্য কোচেরা খাপ-খাইয়ে নিতে পারে না। আর মেধাবী ছাত্ররাই সব সময় স্বয় গুরুর গুরুগিরি টপকে যেতে। সেদিক থেকে সুরজিত উচ্চাভিলাষী। এইরকম এগারটা সুরজিত থাকলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমরা অনেক অপমান ঘোচাতে পারতাম।

অল—তুলনামূলকভাবে নারিন্দর গুরুং ভবিষ্যতে সুরজিতকে টপকে যাবে। এখনই যা সে খেলে তাতে মাঝে মাঝে সুরজিতও ওর পাশে টিমটিমে লাগে।



স্ট্রাঃ—তাহলে দীর্ঘ আট বছর প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলেও সুরজিতের নাম তুল্যমূল্য বিচারের সময় কেন ভেসে ওঠে! এইখানেই সুরজিতের শ্রেষ্ঠত্ব। আর, দুই প্লেয়ারকে কখনও সময় বেঁধে দৌড় প্রতিযোগীদের মত একই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড় করানো সম্ভব নয়। সুতরাং ওই তুলনার কোনও ভিত নেই। ভুললে চলবে না, নরিন্দর গুরুং-য়ের কম তার বয়োসচিত। সুরজিতও সমভাবে ওই কম বয়সে একই দক্ষতা দেখায়নি, একথা কে অস্বীকার করবে।

অল—এখন প্রমাণিত সত্য যে সুরজিতের বিগ ম্যাচ টেমপারামেণ্ট নেই। যেটুকু আছে, সেটুকু দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে যাওয়ার টেম্পারামেণ্ট ছাড়া কিছুই নয়।

স্ট্রাঃ—এই সুরজিতের প্রসঙ্গে বিগম্যাচ নিয়ে একটা ভুল ধারণা চালু করা হয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যেহেতু দেশের বড় টিম তাই এই ম্যাচগুলিতে খারাপ খেলা নিয়ে সুরজিতকে খোঁটা দেওয়া হয়। এক বিখ্যাত প্লেয়ারকে সুরজিতের দক্ষতার সূচক ভেবে ছোট্ট উদাহরণ দিই—তাবর বড় প্লেয়ার চুণী গোস্বামীর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়ুয়ে ভূমিকাগুলি একবার স্মরণ করুন। চুণী অন্য বড় ম্যাচে যা খেলেছে সেই ভূমিকাকে ইস্টবেঙ্গলের খেলাগুলির সঙ্গে তুলনা করুন। তাহলেই উত্তরটা পেতে অসুবিধা হবে না। সেই সব ম্যাচে চুনী থাকতো ইস্টবেঙ্গল ডিফেনডারদের টার্গেট। সমভাবে সুরজিতকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানও সেইভাবে ভেবেছে। আমার মনে হয় শ্যামথাপা বাঙাল অথবা ঘটি ঘরের ছেলে হলে তারপক্ষে এই বিগ ম্যাচে বিরাট ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হত না। সারা ম্যাচে সদাই কড়া নজরের আওতায় থেকে প্রত্যেক ভাল প্লেয়ারের পক্ষেই দপ্ করে ছাড়া সব সময় জ্বলে ওঠা সম্ভব হয় না।

অল—সুরজিত টোটাল ফুটবলার নয়। মানসিক পটুতাও তার কম। সময়মত নিজেকে সে সংযমী করে তুলতে পারে না।

স্ট্রাঃ—টোটাল-ফুটবলারের কেষ্টঠাকুর এখন ভারতে নেই। ওই সংজ্ঞার কাছাকাছি যেতে পেরেছে ইন্দর সিং। মানসিক পটুতার প্রসঙ্গ নেহাতই আবছা। মনের দুর্বলতা সুরজিতকে কেন, কী কারণে নাড়া দিচ্ছে সেটা তদন্ত করে তবেই তার উপর দোষ চাপানো যেতে পারে। সংযম ও মানসিক পুষ্টি প্রায় কাছাকাছি দুই প্রসঙ্গ।

অল—সুরজিত সম্পর্কে বড় দোষ সে ক্লাব প্রশাসনে অহেতুক নাক গলায়। ওর জন্য কর্মকর্তাদের উপর অ্যালার্জি থেকেই যায়।

স্ট্রাঃ—এ নিয়ে বহু অভিযোগ কানে আসে। অসময়ে সুরজিতের উপর দোষারোপ করে লিফলেটও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চত্বরে উড়তে দেখা গেছে। কিন্তু সুরজিতের বিরুদ্ধে কর্মকর্তাদের যুদ্ধের বহর দেখে মনে হয়, ওরা যেন হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সুরজিতের বিরুদ্ধে সরাসরি যদি কোনও সওয়াল থাকে তবে ঢাকাঢুকি না দিয়ে সবাইয়ের সামনে খুলে বলা হোক্। সুরজিত যখন মাঠে খেলবে তখন বলা হবে, সে যেন দলের সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে খেলে। তা না হলেই দোষ। আর মাঠের বাইরে কর্মকর্তারা দলাদলি করে ক্লার সংহতি বিনষ্ট করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু সুরজিত যদি প্লেয়ারের স্বার্থ দেখতে একজোট হয় তাহলেই যত অমঙ্গল। এ কেমন যুক্তি। যেখানে অপরের প্রশ্ন আছে, সেখানে ভুল ধারণার বস্তা=বহনকারী কর্মকর্তার চোখ খুলে দিতে সুরজিত জোটবদ্ধ হলে অন্যায় কোথায়?

অল—গত বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিপর্যয়ে সুরজিতের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা কারো অজানা নয়। কর্মকর্তাদের সঙ্গে সে কোনও সমঝওতায় আসেনি।

স্ট্রাঃ—ব্যাক্তিগতভাবে ওই প্রচ্ছন্ন শব্দ দিয়ে আমি বিপর্যস্ত করতে চাই না। দৃশ্যত: সবাই জানে, গত বছর ইস্টবেঙ্গলের যতটুকু ভাল খেলা তাতে ওই উইং কম্যানডারের অবদানই বেশি। সেখানে পানজাবী ঘরানার অবদান একটি শীল্ডের ম্যাচ ছাড়া সবেতেই কম। আর সমঝওতার প্রশ্ন তখনই আসে, যখন ক্লাব কর্মকর্তারা সেই শর্তটুকু মেনেছে কিনা তার ঠিকমত ওজনে সদিচ্ছা দেখায়। বাঙালী-অবাঙালী প্লেয়ারের দ্বন্দ্বের দায়ভাগ কর্মকর্তাদেরও কম নয়। তারা ওই প্লেয়ার রিক্রুটের সময় সেট-টীম ডিস্টার্ব করার কথা একবারও কি ভেবেছিলেন? এছাড়াও গুরু অপরাধে অপরাধী গুরদেব কতটা আর শাস্তি পেয়েছে? দেবরাজ এবার ইস্টবেঙ্গল টীমে আসবে কি আসবে না সেটা গুরদেব এবছর ইস্টবেঙ্গল টীমে খেলবে=কি=খেলবে=না সিদ্ধান্তের উপরই ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছে।

অল—সুরজিতকে নিয়ে সাংবাদিকরা বেশি মাতামাতি করে। সে অনুপাতে ওর খেলার ধার নেই। এর জন্য একটু ভ্রু-উঁচু হয়েই

থাকে। আসলে যতটুকু ওর প্রাপ্য তার চেয়েও সে ফাঁকতালে বেশি পেয়েছে। ফলে ওর মধ্যে একটা ডোনট কেয়ার ভাব এসে গেছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি ওর প্রতি খারাপ কিছু করে থাকে তার জন্য সে নিজে ক্লাব ছাড়তে পারে কিন্তু সঙ্গে আরও কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে ওর খেলোয়াড়চিত দিকটা কালি ঢেলে দিল। আর সাংবাদিকদের সঙ্গে ওর ব্যবহারটাও ভাল নয়। এক সাংবাদিককে তো সে প্রায় হিড়হিড় করে ক্লাব থেকে টেনে বার করে দিয়েছিল। এসব ব্যবহার কী একটা ভাল প্লেয়ারের পরিচয় বহন করে। ওর জনপ্রিয়তা যে কমছে, কারণ ইস্টবেঙ্গল ছাড়লে মোহনবাগানও ওকে নিতে আগ্রহ দেখাত। কিন্তু তারাও সুরজিতের বিষয়ে নিশ্চয়ই শঙ্কিত।

স্ট্রাঃ—কোনও সাংবাদিককে সুরজিততো পায়ে ধরে বলেনি যে ও মশাই, আমার দিকে একটু আদরের চাউনিতে তাকান। সে খেলে মুগ্ধ করে এই আদর আদায় করেছে। আত্মসমীক্ষা করলে দেখা যাবে, সাংবাদিকরাই গৌতম সরকারকে "বেকেনবাওয়ার" বানায় এবং প্রয়োজনে কলকাতায় পেলের উপস্থিতি জেনেও "সুরজিত"-কে দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় নোঙর খবর সাজিয়ে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানো হয়। কোন ক্রীড়া=সাংবাদিককে সুরজিত তাঁবু থেকে বার করে দিয়েছিল সে প্রসঙ্গে আনুপূর্বিক ঘটনায় জেনেছি—সুরজিত



ওই ঘটনার আগে সস্ত্রীক প্রেস বকসে খেলা দেখতে ওই বিশেষ প্রতিবেদকের দ্বারাই অপদস্থ হয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিজ্ঞতা আছে। ময়দানে ক্রীড়া=সাংবাদিক প্রেস বকসে কোনও আগন্তুক ঢুকলে কিছু শ্রেণীর সাংবাদিক রে-রে করে প্রায় মারতে আসেন। এতে তাদের নাকি শ্রেণীচ্যুতি ঘটে। আরও ঘটে কাজের ব্যাঘাত। সাংবাদিকের নিরাপত্তা তার প্রেস বকসে, সমভাবে প্লেয়ার যদি সেই একই জিনিষ তাঁবুতে থাকাকালীন চায় তাহলেই অন্যায়।

ক্লাবে থাকাকালীন সুরজিতের উপর আক্রোশ বশতঃ অন্য প্লেয়াররাও যদি কর্মকর্তাদের কু-নজরে থাকে তবে সুরজিতের ক্লাব পাল্টানোর সময় অন্যরাও তার পথের পথিক হওয়ার মধ্যে কোন কিছু গর্হিত ব্যাপার থাকতে পারে না। আর কলকাতার এই সাম্প্রদায়িক ফুটবলের ভোজবাজিতে যদি কোনও প্লেয়ার দীর্ঘদিন এক ক্লাবে থেকে বেশি আনুগত্য দেখায় তাতে ক্ষতি কি। এতে সারা একে সুরজিত একজন খাঁটি পূর্ব-বঙ্গীয়। সেখানে অভিমানী সুরজিত রাতারাতি ঘটি বনে যাবে—এ কথা মোহনবাগান কর্মকর্তারা কখনই ভাবতে পারে না। আরও কথা বিদেশ-মানসের সঙ্গে তাদের বনিবনায় তেমন চিঁড় ধরেনি। সুতরাং মোহনবাগান সুরজিতের প্রতি চোখ রেখেও সঙ্গত কারণে মাথা ঘামায় নি।

অভিমানে ভোল পাল্টে লাল-হলুদ হল সাদা-কালো / শিশির ঘোষ

মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ স্টার ফুটবলারদের মাঠ ছাড়ার আগে মহমেডানের সরাইখানায় এক দু'বছর কাটিয়ে যাওয়া দেখতে আমরা অভ্যস্ত। দুই প্রধান প্রতিপক্ষের গোছানো সংসারে হানা দিয়ে কোন 'তারকা'-কে কক্ষচ্যুত করতে মহমেডানকে দেখা যায়নি। কয়েক বছর আগে এক সেরা স্টপার ব্যাক এবং লিঙ্কম্যানকে দলে পাওয়ার জন্য এক রাজনৈতিক নেতার সামনে ভেট দেওয়া স্বত্বেও শেষ পর্যন্ত মহমেডান কর্তৃপক্ষ তাদের ঘরে তুলতে পারে নি। ওই দুই খেলোয়াড় বেশ কয়েক দিন মহমেডানের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে চুটিয়ে বিরিয়ানী-মোগলাই খেয়ে শেষ পর্যন্ত কলা দেখিয়ে কেটে পড়ে। এ বছর তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। ঘটনা এই লেখার সময় পর্যন্ত যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে নির্ভর করে বলা যায় মহমেডান আগামী মরশুমে কাগজে কলমে ময়দানের সেরা দল গড়তে চলেছে।

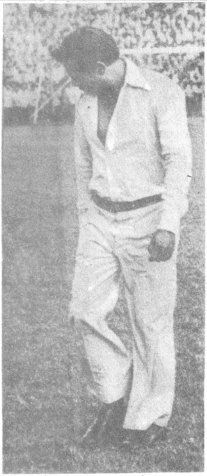
নির্বাচন নিয়ে সাংবিধানিক কচ্‌কচানি মেটাতে না পারায় এবার মহমেডানে সাধারণ নির্বাচন হয়নি। ক্লাবের ট্রাষ্টি বোর্ড ক্লাব অধিগ্রহণ করে পুরানো কমিটি ভেঙে দিলেন। গজিয়ে উঠল হরেক সওদার ব্যবসায়ী এরফান তাহেরের সভাপতিত্বে একটি অ্যাডহক কমিটি।

আস্থা পেতে নতুন কর্মকর্তাদের সামনে চির-পুরাতন একটা রাস্তা তখন খোলা। জবরদস্ত টিম তৈরী করে দু চারটে ট্রফি



সমরেশ চৌধুরী

জিতে মেম্বারদের হতাশা দূর করা। চির পরিচিত হায়দার আলী নক্বরের 'পাবলিক রিলেশন্‌স' দক্ষতার উপর নতুন কমিটির সকল সদস্য মায় সভাপতি এরফান তাহেরও যথেষ্ট ভরসা রেখে এগোতে শুরু করেন। ফুটবল দল গড়ার আগে প্রথমেই তাঁরা কোচ নির্বাচন পর্ব সেরে নেন এবং এ ব্যাপারে অমল দত্তের সঙ্গে ফয়সালা হওয়ার দিন অমলবাবুই প্রথম নাকি সুরজিতসহ ইস্টবেঙ্গলের বেশ কিছু



অমল দত্ত কি এবার কালো-সাদার কোচ থাকবেন?

খেলোয়াড়ের মনের অসন্তোষ সম্বন্ধে মহমেডান কর্মকর্তাদের যোগাযোগের জন্য সামান্য আভাষ দেন।

সুরজিত সমেত একমন—একজোট একটি বড় দলের সঙ্গে দফায় দফায় ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তাদের বৈঠক ভেঙে যাওয়ার খবর মোটামুটি সকলেরই জানা ছিল। ইতিপূর্বে সুরজিত দল ছাড়া এবং নতুন কোনও দলে যাওয়ার প্রশ্নে নিউ মারকেট অঞ্চলে একদিন গৌতম সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করে। শোনা যায়, গৌতম সরকার যথার্থ ভরসা দিতে না পারায় সুরজিত মহমেডানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা চালাতে থাকে। আরও শোনা যায় পিণ্টু চৌধুরির সঙ্গেও ব্যক্তিগত যোগাযোগ চালাতে থাকে।

ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা পিণ্টুকে দল থেকে ছাটাই করে বেশ আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মাঠের ভেতরে বা বাইরে পিণ্টু যে একজন দক্ষ খেলোয়াড় এ সত্য তারা একবারও খতিয়ে দেখেন নি। হায়দার আলীর সঙ্গে পিণ্টু চৌধুরির প্রায়ই সৌজন্য বিনিময় সাক্ষাৎকার চলতে থাকে। মাস কয়েক আগে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের পিণ্টু চৌধুরির সাহায্যে দল গড়ার প্রচেষ্টার কথা শুনে মহমেডান কর্মকর্তারা পিণ্টুর আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এমতাবস্থায়, মহমেডানের হয়ে 'সুরজিত অ্যান্ড কোম্পানীর' সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার দায়িত্ব পেয়ে পিণ্টু যেন হাতে স্বর্গ পেল। (নিজের সম্বন্ধে আস্থা ফিরিয়ে আনার!) মহমেডান কর্তৃপক্ষ কোনও রকম মাধ্যমের ধোঁকায় না থেকে প্রথমেই সুরজিত—এরফান তাহের সরাসরি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিশন রো বেনটিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে 'বাণিজ্যিক ভবনের' তেতালায় প্রথম বৈঠক বসে ২২শে ফেব্রুয়ারী। এরফান তাহেরের দরাজ দিল এবং খোলা হাতের কথা সর্বজন বিদিত। সুরজিত-প্রশান্তকে তিনি পরিস্কার জানিয়ে দেন পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে না এবং এ ব্যাপারে সুরজিতকে তিনি সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তবে তাঁর একটাই শর্ত— 'কথার খেলাপ যেন না হয়।'

দু' তিন দিন পর আবার বৈঠক বসে এবং শোনা যায় সেদিনের বৈঠকে নাকি মোট ছজন বিক্ষুব্ধ ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড় উপস্থিত ছিল। লেন দেনের বিষয় ফয়সালার ঠিক আগের মুহূর্তে নাকি মিহির বসু 'ওয়াক আউট' করে। শোনা যায়, ডেভিড উইলিয়ামসকে দেখে নাকি নিজের স্থান সম্বন্ধে তার ভীতির উদ্রেক হয়েছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে যাওয়ার পর প্লেয়ারদের 'আনডার গ্রাউণ্ডে' পাঠাবার প্রশ্ন ওঠে। শোনা যায়,



সুরজিত—শ্যামল

এক কর্মকর্তা আরশাদ সায়গলের বেগবাগান অঞ্চলের বালু হক্কক লেনের বাসভবনে সব ক'জন খেলোয়াড় প্রথম কদিন আত্মগোপন করে। সেই সময়ে ডেভিড উইলিয়ামসকে নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। প্রায়ই তার সিনেমা দেখার ঝোঁক চাপলে ডেভিড কাউকে কিছু না বলে ট্যাক্সি নিয়ে কর্মকর্তাদের কারও কারও ডেরায় হানা দিতে থাকে। বিব্রত ক্লাব কর্তৃপক্ষ তখন খেলোয়াড়দের অধিকতর গোপন স্থান 'গুলাবি টি এস্টেটে' পাঠিয়ে দেন



ডেভিড উইলিয়ামস

'এবং শোনা যায় তারপর আরও গোপনে রাখার জন্য পরে তাদের কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছে। লইয়ের একদিন আগে তারা কলকাতা ফিরবে বলে ঠিক করা হয়।

এরকান তাহেরের সঙ্গে বৈঠকের সময় সুরজিত আরো দু একটি শর্ত উত্থাপন করে। যার একটি তার নিজের পত্র পত্রিকায় লেখার বিষয়ে এবং অপরটি দলে সামান্য খুঁত না রেখে সর্বাঙ্গ সুন্দর দল তৈরীর বিষয়ে। সুরজিত দ্বিতীয় প্রশ্নে ভাস্কর-মনোরঞ্জন-সাব্বিরের কথা বোঝাতে চায়। শোনা যায় এ ব্যাপারে মহমেডান সভাপতি সুরজিতকে নাকি 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়েছেন। 'টিমের ব্যাপারে তোমার সমস্ত কথা আমরা মেনে নেব, তবে আমাদের ট্রফি চাই আর লেখার ব্যাপারে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, তবে এমন কিছু যেন লিখোনা বাবা যাতে আমাদের ক্লাবের ক্ষতি হয়।'

শোনা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষও নাকি হাত গুটিয়ে বসে নেই। আই এফ এ-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ক্ষমতাশালী সদস্য নাকি ওই তিনজন খেলোয়াড়কে বোঝাতে এবং আরও কিছু অন্য ক্লাবের খেলোয়াড়কে দলে টানতে সিঙ্গাপুর পাড়ি দিয়েছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এই দৌত্যে কে সফল হন।

বর্তমান কমিটির ঘনিষ্ঠ মহলের খবর কিছু অবাঞ্ছিত খেলোয়াড় ছাটাই সম্বন্ধে তাঁরা মনস্থির করে ফেলেছেন। হাবিব-আকবর-লতিফুদ্দীন-আনোয়ার-সুরিন্দরকুমারকে তাঁরা দলে রাখতে কোনমতেই রাজী নন। তাঁদের ধারণা প্রধানতঃ হাবিবের ঔদ্ধত্যে তাঁদের ক্লাবের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। গত মরশুমে বরদলৈ ট্রফিতে আকবরকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনায় হাবিব কোচ অমল দত্তকে যাচ্ছে তাই ভাবে অপমান করে। পরে ডি সি এম ট্রফির খেলার সময় আবার একই রকম অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এই কারণে কোচ অমল দত্ত নাকি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহমেডান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছলেন। বর্তমান কমিটি প্রথমেই নাকি কোচ অমল দত্তকে 'সম্মানের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে' কাজ করতে দেওয়ার অঙ্গীকার জানিয়েছে।

অশোক চক্রবর্তির স্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শোনা যায়, গত বছরের সহ অধিনায়ককে যথার্থ সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে কর্মকর্তারা অরাজী ছিলেন না। কিন্তু অশোক নিজেই নাকি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছে। সাধারণ সম্পাদক এবং ফুটবল সম্পাদক সহ সাব কমিটির সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সাঙ্গ হবার পরও সভাপতির সামনে নতুন শর্ত আরোপের চেষ্টা কেউই সুনজরে না দেখায় ক্লাব অশোককে হারাতে চিন্তিত নয়। তাছাড়া, প্রেমনাথ ফিলিপ চিন্ময় মনোরঞ্জন-মহীদুল—গোরাঙ্গ'র লাইন আপে অশোককে জায়গা দিতে পারার ব্যাপারে কোচ অমল বাবুও যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত। সুভাষ রায় এখন ইস্টবেঙ্গলের খপ্পরে। গত বছর ভাল খেলেও যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়ার অজুহাতে সুভাষ অনেক দিন থেকেই দলত্যাগের চিন্তা করছিল। ইস্টবেঙ্গল স্টারদের আসার খবর জেনে ও আগেভ গেই সরে পড়ে। হয়ত গুজব, তবুও শোনা যাচ্ছে ভাস্করের আগমনকে কেন্দ্র করে নাসির আমেদ নাকি দলে থাকতে তেমন আগ্রহী নয়। যদিও ভাল দল গড়ার জন্য প্রি-ওলিম্পিক ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেই নাসির সিকিম রাজ্য দলের খেলোয়াড় পি এন দোরজিকে দলে নিতে কর্মকর্তাদের কাছে আর্জি জানায়। দোরজি সন্তোষ ট্রফি এবং প্রি-ওলিম্পিক ট্রায়ালে দারুণ খেলেছে। মহমেডান কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে দোরজি গত ৩ই ফেব্রুয়ারী আবার সিকিম ফিরে গিয়েছে। প্রেমনাথ ফিলিপ এবং অমলরাজ এক সময়ে ইস্টবেঙ্গলে যাবার সম্মতি জানিয়েছিল এবং শোনা যায় ফিলিপ নাকি কিছু আগামও নেয়। মহমেডান কর্তৃপক্ষ সেই সখ্যতায় ছেদ টানতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। অগ্রজ জনের মত করিয়ে অমলরাজকে দলে রাখতে ক্লাবের 'চিফ এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার ও হায়দার আলী নস্কর স্বয়ং জনের কর্মস্থল রাঁচীতে হানা দেয়। গন্ধ পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের ও হৃষ্টপুষ্ট এক কর্মকর্তা রাঁচী ছোটেন। অন্যান্য ব্যবস্থা যদি ঠিক থাকে এবং সুরজিতের দৌত্য যদি সফল হয় তাহলে আগামী মরশুমে মহমেডান দল হয়ত—

গোল—ভাস্কর গাঙ্গুলী, নাসির আমেদ (রাখার চেষ্টা চলছে) এবং দিলীপ পাল।

ষ্টপার ও ব্যাক—প্রেমনাথ ফিলিপ, চিন্ময় চ্যাটার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহীদুল ইসলাম, শ্যামল ঘোষ, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী।

লিঙ্কম্যান—সমরেশ চৌধুরি, প্রশান্ত ব্যানার্জী, অমলরাজ, পি এন দোরজি।

ফরোয়ার্ডস্—সুরজিত সেনগুপ্ত, সাব্বির আলী, ডেভিড উইলিয়াম্স্, দেবাশীষ রায়, দীনকর ও ডেনিস উইলিয়ামস।

অধিনায়ক কে হবেন, সমরেশ না সুরজিত, এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার হয়ত অবকাশ রয়েছে। তবে আমার খবর 'সমরেশ দা'র অধিনায়কত্ব মানতে সুরজিতের তেমন কোনও আপত্তি থাকবে না।



ভাস্কর গাঙ্গুলি

ময়দানব

বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো দিন কে দিন যে ভাবে ওলিম্পিক গেমস বয়কট করছে, তাতে বেশ ভাববার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন কি হবে, যখন ভারতকে এই গেমস আয়োজনের ভার দেওয়া হবে। ভবিষ্যতের সেই ছবিটা যেন দেখতে পেলাম, সেদিন রাতে, ময়দানে সত্তরটা ফুটোর তেরপলে ঢাকা বেঙ্গল ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ফাঁকা তাঁবুতে গিয়ে।

সে বছর ওলিম্পিকের ভার নিতে আগ্রহী ছিল মাত্র দু'টি দেশ—ভারত ও জাপান। আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি সেবার দীর্ঘ সাতদিন একটানা মিটিং করার পর সিদ্ধান্ত নিলেন—দেশ দু'টির মধ্যে ভারতকেই তাঁদের বেশি পছন্দ। সুইজারল্যাণ্ডের ওই মিটিংয়ে তদ্বির তদারকির জন্ত যে ক'জন ভারতীয় কর্মকর্তা ওখানে গিয়েছিলেন, সরকারী খরচায় তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী, শ্যালক-শ্যালিকা এবং সন্তানদের বিরাট একটি দল যাওয়ায় আই ও সি-র সদস্যরা নাকি দারুণ ইম্‌প্রেসড্‌ হয়েছিলেন।

ঠিক হলো, কলকাতাতেই ওলিম্পিক হবে। কেননা, স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে দেখা গেল, খেলা দেখতে যাওয়া বেকার লোকের সংখ্যা—বোম্বাই ও দিল্লির তুলনায় কলকাতাতে অনেক বেশি। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কেই স্টেডিয়াম তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হলো, যিনি মাত্র আট মাসের মধ্যেই একবার ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরী করে দিয়েছিলেন যে স্টেডিয়ামের ছাদ চুঁইয়ে বৃষ্টির জল বিশ্ব টেবল টেনিসের খেলা প্রায় পণ্ড করে দিয়েছিল। গেমসের বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থাপনার ভার পেলেন এম দত্তরায়, গোপীনাথ ঘোষ, মুকুল আমিন, ও সন্তোষ গাঙ্গুলী—সে সময়ে যাদের মতো দক্ষ 'পেশাদার' কর্মকর্তা আর নাকি কেউ ছিলেন না। সাংবাদিকদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হলো, মতি নন্দীকে



—ক্রীড়ায় সাহিত্য এবং সাহিত্যে ক্রীড়া—আনার ব্যাপারে একমাত্র বাঙালী সাংবাদিক যিনি ওলিম্পিক কভার করতে একদা মসকোতে গিয়েছিলেন।

কলকাতা গেমসের ব্যবস্থাপনার জন্ত যত খরচ করা হলো, তার দ্বিগুণ বেরিয়ে গেল সিকিউরিটির ব্যবস্থাতে লালবাজারের সব কনস্টেবলকে মোতায়েন করা হলো স্টেডিয়ামের চারপাশে যাতে কেউ টিকিট কালোবাজারে বিক্রি না করতে পারে। আর বিনা টিকিটে যাতে গেমসের সব খেলা দেখতে পারেন, সে কারনেই পুলিশ অফিসারদের রাখা হলো স্টেডিয়ামের ভেতরে খরচ বাঁচানোর জন্ত ওলিম্পিক ভিলেজ করা হলো মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল গ্যালারীর তলায়, যেখানে পাতা হলো হাজার চারেক দড়ির খাটিয়া—প্রতিযোগীদের শোয়ার অসুবিধা যাতে বিন্দুমাত্র না হয়।

গেমসের আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পরই শুরু হলো ঝামেলা। তোংগো দ্বীপপুঞ্জ থেকে কফি আমদানী নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এমন মনোমালিন্ত আরম্ভ হলো যে, আমেরিকা কলকাতা গেমস বয়কট করল। শেষপর্যন্ত রাশিয়াও আসতে পারল না, তাদের বেশির ভাগ খেলোয়াড় আফগানিস্তানে সামরিক কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়। বর্ণ বৈষম্যের প্রতিবাদে আফ্রিকান দেশগুলি বহুদিন আগেই ওলিম্পিকে আসা বন্ধ করেছিল, সুতরাং ওদের অংশ নেবার প্রশ্নই ওঠে না। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিও জানাল, কলকাতায় যাওয়ার খরচ অনেক, সে কারণে টিম পাঠাবে না।

নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া জানাল, রুশ-মার্কিন ঝগড়ার মাঝে গেমসে এসে তারা পরে ঝামেলায় পড়তে চায় না। ইংল্যাণ্ড আগেই বলে দিয়েছিল, কলকাতার পানীয় জল তাদের খেলোয়াড়দের পেটে সহ্য হয় না—তাই তারা কলকাতা গেমসে যেতে অনিচ্ছুক। ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেদের ঘরোয়া খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, বলে তারাও কলকাতা এলো না ফরাসীরা কখনও মশা-মাছি দেখেনি, তারা কলকাতায় আসবে আগ্রহ দেখিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায় দড়ির খাটিয়ায় শুতে হবে বলে। এশীয় দেশের মধ্যে জাপান গেমস বয়কট করল তারা গেমসের ভার পায়নি বলে। পাকিস্তান এল না রেফারী, কাজ ও আম্পায়ারদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ করে। এই কারণেই এশিয়ার অন্য মুসলমান প্রধান দেশও কলকাতা গেমস বয়কট করল।

শেষ পর্যন্ত কলকাতা গেমসে অংশ নেবার জন্ত যে দেশটি বাকি রইল, সেটি—ভারত। এটাই শেষ ওলিম্পিক। ইতিহাসে এই ওলিম্পিক অনন্ত নজীর হয়ে রইল কারণ, এই ওলিম্পিকে একটি দেশই প্রাধান্ত বজায় রাখল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সব ক'টি মেডেল ও ইভেনট জিতল একটি দেশই। তবে একটা উল্লেখ্য ব্যাপার, এই ওলিম্পিকই একমাত্র ওলিম্পিক যেখানে কোনো রেকর্ড ভাঙা-গড়া হল না।

কীভাবে ওরা ট্রফি পায়!



স্ট্রাইকার

প্রসূনরা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছে ভারতের হারের মালা গলায় পরে। নিশ্চয় ওরা খালি হাতে ফেরেনি। ওদের বডি-গার্ড ছিল বড় ক্লাবের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি। বেশ সময়েই ওরা ফিরে এল। আর সপ্তাহ কয়েক বাদেই ময়দানে সেই লোক-ঠকানো সাম্প্রদায়িক ফুটবল পেটাপিটি শুরু হচ্ছে। ফুটবল নিয়ে বাঙাল-ঘটি-মুসলমানের খেয়োখেয়ি এটাই ময়দানের চট্-জলদি ফুটবল-কালচার। তিন সওদাগর তিন ক্লাবের মাথা। লোহালক্কর, ওষুধ, চা-চিংড়ি তিনরকম ব্যবসায় ওরা ঝানু। ওদের ব্যবসায়ী হাওয়া প্লেয়ারদের মনেও কেমন তুলুনি দেয়। দেখতে দেখতে গরীব-গুরবো ঘরের প্লেয়ার ছেলেগুলো কেমন চটপট কিট-কাট বিজনেসম্যান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হক্ কথা, ওরা পা-ভাঙিয়ে খায়, আর ক্লাব সুনাম ভাঙায় ট্রফি পেয়ে। বেশ মজাদার যোগাযোগ।

যে করে হোক্ ট্রফি পেতেই হবে—এটাই ময়দানের বড় ক্লাবের শ্লোগান। কোনও টিম ঠিকঠাক খেলে জিতলেও নিন্দুকরা ছোঁক্ ছোঁক্ করে প্রচার দেয় পাকা বন্দোবস্তের খেলায় যতোসব টিম জিতছে। এমনকি দুই বাঘা-টিমের খানদানি খেলা ড্র হলেও ময়দানে ঢি ঢি পড়ে। গত বছর ৭ জুলাই লীগের খেলা নিয়ে অদ্ভুত আপাতবিশ্বাস্ত ব্যাখ্যা এখনও ময়দানময় পাক খেয়েছে—দুটো টিমই গা সোঁকাশুঁকি করে খেলাটা ড্র করে ছাড়ল। যাতে শান্তিভঙ্গ না হয় সেদিকেই শুধু নজর ছিল। মানিয়ে গুছিয়ে দুই টিমের টপ স্কোরার গোল করল দুই অর্ধে। আর ড্র হওয়ার আভাস চুনী গোস্বামী আনন্দবাজারে তো দিয়েই রেখেছিলেন।

এমন গট-আপ ম্যাচ হিসাবে তারা গত বছরের এরিয়ান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচকেও চিহ্নিত করেছে। গল্পটা এইরকম—"এক হোমগার্ডের অফিসার (পদবী ব্রাহ্মণ) অনুচরসহ হাফটাইমের সময় এরিয়ান কর্মকর্তাদের কাছে ঝুলোঝুলি শুরু করে। তারা এরিয়ানের পিনটু (কাল্পনিক নাম) মিত্রকে বলেই ফেলে—হ্যাঁরে পিনটু এটা হচ্ছে কী? এরিয়ান কী লীগ চ্যাম্পিয়ন ফাইট করবে যে এত তোড়জোড় করে খেলছিল।" এরকম ম্যাচ মোহন-এরিয়ানও খেলেছে। সে মনগড়া কাহিনীও এই ধাঁচের—রেফারী সুনীল অধিকারীকে ম্যাচ করতে নামতে দেখেই সারা মোহন-দর্শক কাঁই হয়ে যায়। একসঙ্গে রে রে করে ওঠে—সুনীলের তো এ ম্যাচ করার নয়। ও তো ইস্টবেঙ্গল ফিকশ্চার-প্যানেলের রেফারী। অন্য ক্লাবের নিশ্চয়ই হাত আছে। তারা নাকি আই. এফ. এ দফতরে জানায় সুনীল অধিকারী রেফারী না হলে এরিয়ান নিজ সাধ্যে মাঠে নামতে পারবে না।" ময়দানের বিশেষ সূত্রের কাছে উড়ো খবর ছিল—এরিয়ানের কয়েকজন প্লেয়ার '৮০ সালে বছর বড় টিমে খেলতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাগুলির মধ্যে আদৌ সত্যতা নেই বলেই আমার ধারণা। তবে দোনামনা লাগে বড় টিমের খেলার আগে যখন শুনি অমুক সেন, তমুক চাটুজ্জে রেফারী হবে। পরে কখনও কখনও আশ্চর্যভাবে গুজবে-বাস্তবে কোলাকুলি ঘটে। সন্দেহের আঁশটে গন্ধ তখনই পেতে শুরু করি। সব-



নির্ভীক ক্রীড়া সাংবাদিক

ক্ষেত্রেই রটনাকারী, নিন্দুকের দল। কিন্তু কথায় বলে যা রটে তার কিছুটা ঘটে। এটা সত্যি গত বছর রেফারীজ পোস্টিং কমিটিতে বড় ক্লাবের এক বিরাট কর্মকর্তা ছিল। ম্যাচের রেজাল্ট নিয়ে ফাটকার খবরও শুনি। নিছক রেজাল্ট কেন,. আগাপাছতলা ময়দানের বড় ক্লাবের ভাঁড়ার হাটকে ধারণা-হয়েছে ফুটবলকে কেন্দ্র করে উপরতলায় এক অদ্ভুত ভোজবাজি চলেছে। উচিত লোকজন খুঁজতে গিয়ে শেষে হন্যে হয়ে স্বীকার করছি ঠগ্ বাছতে ময়দান প্রায় উজাড় হওয়ার দাখিল।

এক ফাঁকে নিজেদের আয়নায় একটু মুখ দেখে নিই। ছোট টিম একে অপরের গা টেপাটিপি করে ম্যাচের রেজাল্ট খাড়া করলে তা নিয়ে খেলার-খবর লেখকরা বেশ সরব হন অথচ বড় টিমের বেলায়ই যত ঝোল টানা-টানি। তাহলে কী ধরে নেব বড় টিমের অস্বস্তিকর কোনও ঘটনাকে জনসমক্ষে তাঁরা পেশ করতে চান না। যাই হোক ক্রীড়া-সাংবাদিকরা মোটেই ভীতু নন। তবে তাঁদের কলম থেকে দগ্‌দগে সত্যি কিছু ঝরলে সমর্থকরা বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে। প্রয়োজনে ক্রীড়া-সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ভূরি ভূরি হাজির করা যায়। মাঠের প্রেস-বক্স আর নিরাপদ পবিত্র স্থান নয়। ওটা এখন দর্শক-সমর্থকের বুমেরাং হানার টার্গেট।

বড় টিমের ম্যাচের ফল বন্দোবস্ত নিয়ে অঢেল শুনেছি। ভাবিই নি যে কোনও প্লেয়ার এই গর্হিত সন্দেহভরা ঘটনায় আলোকপাতে রাজি হতে পারেন। এই রকম একটি স্বীকারোক্তি করে সর্বপ্রথম সাহসিকতার নজির রাখলেন অলপারপাস ফুটবলার কাজল মুখার্জি। ষাট ও সত্তরের দশকে টানা পনের বছরের কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল এই অসাধারণ ফুটবলারের অধিগত। যে কোনও ক্রীড়া-প্রতিবেদকের কাছে কাজলের বক্তব্যের-ধ্বনিটি বেশ আকর্ষণীয়। হয়তো কাজলকে নিয়ে বেশী আদিখ্যেতা হচ্ছে বলে কেউ ভ্রূ-কোঁচকাতে পারেন। বলবশকারীর ভূমিকায় কাজল মুখার্জী কি ছিল তার হিসাব চুনী গোস্বামীর মত স্কিলের কারিগররাই নিখুঁত হদিশ দিতে পারেন। তবে নিরপেক্ষ মতে চুনী ও কাজল বলের-ভূগোল আয়ত্ত করার খেলা ভিন্নধর্মী ফুটবলার। ওরা যে যার আলাদা ঘরানার ওস্তাদ। কর্মকর্তাদের কাছে কাজলের জিভটা ছিল শেফিল্ডে শানানো ক্ষুরবিশেষ। বিনা ভণিতা সহ, কাজল কিছুদিন আগে এক ইন্টারভ্যুয়ে বলেন—হ্যাঁ তিন বড় টিমই ম্যাচ গট আপ করে বলে জানি। ট্রফির লড়াইয়ে কলকাতার মাঠে বড় ভূমিকা নেয় বড় কর্মকর্তার চেয়ে তাদের আশপাশে ঘুরঘুর করা স্তাবকরা। দুর্বল-টিমের বিরুদ্ধে নিশ্চিত জেতা ম্যাচের আগে ক্লাবে তারা আতঙ্ক ছড়ায়, বারবার হুঁশিয়ারী দেয় অমুক প্লেয়ারকে অথবা কর্মকর্তার সঙ্গে আগেভাগে বোঝাপড়া না রাখলে হয়তো ম্যাচ ফসকে যেতে পারে। এতে ভেট দিতেই হয়। আবার এই ভেট থেকেই বন্দোবস্তকারীরা কমিশন পায়।"

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৫-র জর্জের সঙ্গে মোহনবাগানের ম্যাচের ঘটনা মনে পড়ল কাজলের —সে ম্যাচে কাজলের টিম মোহনবাগান চুনীর হ্যাটট্রিকসহ জেতে পরিষ্কার পাঁচ গোলে। পাঁচ গোলের পরে জর্জের মনা ঘোষ হৈ-চৈ শুরু করে—"গজুবাবুর সঙ্গে কথা ছিল ছ-গোলের তাহলে পাঁচ গোল হল কী করে?"

কাজলের মতে—"ইস্টবেঙ্গলের সত্তরের দশকে ছ'বছর লীগ জয়ে মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের অবদান ছাড়াও মাঠের বাইরে জীবন-পল্টুর অবদানও কম নয়।" এই কথাগুলি বলার সময় কাজলের সামনে দাঁড়িয়ে শুনছিল টালিগঞ্জের স্ট্রাইকার প্রদীপ দত্ত। প্রদীপকে উদ্দেশ্য করে কাজল বললেন—"প্রদীপ অস্বীকার করুক দেখি যে এবার তুই বড় ক্লাবের কর্মকর্তা তাদের টিমের লীগের খেলার আগে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল কিনা?"

কলকাতা মাঠের রেফারিংয়ের সম্বন্ধে কাজলের চাঁছাছোলা কথা— "ময়দানের পচাত্তর ভাগ রেফারীই তাদের কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ। বড় টিমের প্রতি ওঁদের পক্ষপাতিত্ব সকলের জানা। তবে এই টেনেটুনে বড়কে রেখে ছোটকে দমানোর কাজ ওঁরা প্রায় প্রাণের দায়ে করেন। রেফারিরা বাঁশি মুখে মাঠে নামেন ঠিকই কিন্তু ওঁদের বাঁশির-ফুঁ কন্ট্রোল করে মাঠের বড় টিমের কর্মকর্তা সমর্থক সবাই। খেলা চলাকালীন মাঠে কিছু বড় টিমের প্লেয়ার যেভাবে রেফারিকে বাপান্ত ও হুমকি দেয় তাতে তা সহ্য করে কাজ চালানোই দুষ্কর হয়ে ওঠে।

ওই ধরণের সত্য ভাষণের সামনে ময়দানের ফুটবলারের রুজি-রোজগারের প্রসঙ্গে নিখাদ সত্য প্রসঙ্গটি এগিয়ে দিতে দেরী করলাম না।

প্লেয়াররা কী ক্লাবের কাছে খেলে ভাল টাকা পায়?

কাজল—"হ্যাঁ"

এই টাকার হিসাব গোপনে রাখার প্রস্তাব আপনার কেমন লাগে?

কাজল—আদৌ গ্রহনীয় নয়।

সঙ্গে সঙ্গে কাজল আমার মুখ চাপা দেওয়ার ঢঙে হাত তুলে কি যেন বলতে চাইল। আমি প্রায় কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—"আপনি বলতে চাইছেন, প্লেয়ারদের নামে যত টাকা দেখানো হয় তার অঙ্কটা নেহাতই ফাঁপানো। এখানেও ক্লাবের কয়েকজন কর্মকর্তার মোক্ষম অবদান থেকে যায়। প্লেয়ারের তরফে সই করা ভাউচারের অনেক কারচুপি থাকে। বড় ক্লাবের ঘোঁট পাকানো কর্তাব্যক্তিদের অদৃশ্য হাতই খেলা করে।"

ওই কথাগুলো শুনতে শুনতে কাজল যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের আলোয় বক্তাকে নিরীক্ষণ করেছিলেন। আবেগে নিজের প্রসঙ্গ জুড়লেন—মনে পড়ে আয়কর দফতর থেকে বছর চারেক আগে একটা চিঠি পেয়ে ভীষণ রেগে যাই। লেখা ছিল, আমি



রেফারীর মাথার ওপর খাঁড়া

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে খেলার জন্য যে টাকা নিয়েছি তার আয়কর দেওয়া বাকি রয়েছে। সেবছর আদপে আমি ক্লাব থেকে কোনও টাকাই নিইনি অথচ এইরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ? সরাসরি ক্লাব সম্পাদক ডঃ নৃপেন দাসকে ধরলাম, এরকম তথ্য আয়কর দফতরকে কে জানিয়েছে? উনি তখন বড় বেকায়দায়। সঠিক তথ্য জেনে আয়কর দফতর এ নিয়ে আর এগোয়নি।

ক্লাবের কাছে পাওয়া টাকার উপর আয়কর ফাঁকি দেওয়া প্লেয়ারের তরফে কাজল নেই। এই ধরণের সুযুক্তিতে ওর সায় রয়েছে—ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্লেয়ারও আয়কর দিতে বাধ্য। আসলে প্লেয়ার ওই ক্লাবের কাছে পাওয়া কালোটাকা নিয়ে বছর খানেক আনন্দ ফুর্তি ছাড়া স্থায়ী কিছু করতে পারে না। এই সময়টা ওই কাঁচা টাকার ছোঁয়াচ প্লেয়ারকে মনের দিক থেকে প্রায় চুরমার করে দেয়। সে নিজেকে ভীষণ কেউকেটা ভাবতে শেখে। ক্লাবের সঙ্গে প্রাপ্তির চুক্তির সময়ই প্লেয়ার ক্লাবকে সাফ জানিয়ে দিলেই পারে— "আয়করের টাকা কেটেকুটে বা বাদ রেখে প্রাপ্য টাকা দেবেন।" এতে মাঝখানের কারও পক্ষে সমর্থকের টাকায় ভাগ বসানো সম্ভব নয়। পেশাদারী ফুটবলের জোয়ার এতে দ্রুত আসতে পারে। এর জন্য চাই প্লেয়ারের সঙ্গে প্লেয়ারের একতা।

বড় দলের খেলা কোন্ পর্যায়ে গেছে উদাহরণ দিতে কাজল জানালেন—"বড় টিম মাঠে নামার আগে দেখা যায় জনপ্রিয় কোচ গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। ম্যাচের পিঠোপিঠি ওসব লেকচার প্লেয়ারদের মানসিক শান্তি ভঙ্গ করে। কোচ পি. কে হয়তো চেঁচিয়ে বলার সময় শুনতে পেতেন না প্লেয়ারদের বিরক্তি জনিত অস্ফুট কথাবার্তা। সবচেয়ে হাস্যকর লাগত খেয়েদেয়ে এসে মাঠে বড় টিম নামার আগে জীবনের দীর্ঘ ফুটবল বাণী। কোনও ম্যাচই খেলা শুরুর ঠিক আগে অহেতুক জ্ঞান দানে জেতা যায় না। এর জন্য দীর্ঘ পরিশ্রমের প্রয়োজন —এই সহজ কথাটা ওঁরা কেন বোঝেন না। পি. কে, অরুণ ঘোষ, অমল দত্ত প্রমুখ তাবৎ বড় কোচদের নিয়ে কাজলের ধারণা—ওঁরা শুরুতে অনেক বিরাট কিছু ভাবনা নিয়ে এসেও বড় টিমের গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে দেন। প্রয়োজনে নিজেদের ব্যক্তিত্বও বিকিয়ে ফেলেন ওঁরা। গোলমালে যে তিনজন বড় কোচের মাঠে এত রবরবা তারা কিন্তু আসলে প্রকৃত আন্তর্জাতিক মানের ছাপমারা বা পাশকরা কেউই নন। কেউ মাত্র পনের দিনের বিলেত ফেরত হয়েই হাজার গল্পের আলপনা আঁকেন। আবার কেউ ক্রেমার স্কুলে মাস কয়েক এপাশ-ওপাশ করেই ময়দানে মহাপ্রভু হয়ে দাঁড়ান। এদের হাত থেকে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলার লড়াকু টিম বেরবে, এমন ভরসা আমার নেই।"



বড় ক্লাব ছোট ক্লাব

কাজলের এইসব চোখা মন্তব্যে অপিচ বিদগ্ধ ফুটবলজন দোষারোপ করে নঞর্থক কথা বলতে পারেন কাজল কবছর হল মাঠ থেকে সরে গেছেন অথচ এরই মধ্যে এত ফ্রাস্ট্রেশনে কাবু। ঈর্ষায় খাক্ হওয়া আর কাকে বলে!

বিচারের দূরবীন বরং কাজলের দিক থেকে ঘুরিয়ে বর্তমান বড় তরফের দুই ক্লাবের শীর্ষ-স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের উপর ফেলা যাক্। প্লেয়ার আঁচ করেছেন কিনা জানি না, তবে হাজারী প্লেয়ারদের খাঁই মেটাতে অপারগ হয়ে বড় ক্লাবের কর্মকর্তারা একজোট হতে চাইছেন। ইস্যু দুই ক্লাব মিলে একে অপরের প্লেয়ার টানাটানি করবে না। এতে প্লেয়ারের পক্ষে অস্বাভাবিক অঙ্কে দরাদরি করা সহজ হবে না। এরকম সমঝওতা এখনও দানা বাঁধেনি। কিন্তু দানা বাঁধলে প্লেয়ারকুল কী এক হতে পারবে।

ক্লাবের মঞ্চে নিজের ক্ষমতা বিছানোয় অপারগ হলে, কর্মকর্তা কিন্তু নিরস্ত থাকে না। দুই ক্লাবের হোমরা-চোমরা হতে অপারগ কর্মকর্তারাই আই. এফ. এ সম্পাদক অথবা সহসম্পাদনার কেদারা আলো করছেন। সময় বিশেষে বড় ক্লাবের খেলার হার-জেতার সুতো টানাটানিতে এদের হাত সুড়সুড় করবে না, এর গ্যারান্টি কোথায়? লক্ষ্যটা সেই এক বড় ক্লাবের সুবিধাজনক ফিক্সচার কীভাবে হতে পারে। এদের ভেলকির খেলায় কম্প্যুটারও অবাক রেজাল্ট দিয়ে ফেলে। কমজোরি ক্লাবের লীগ ফিক্সচার তৈরীতে প্রচণ্ড নিরপেক্ষতা বজায় রাখে কম্প্যুটার। অথচ কয়েক বছরের ফিক্সচারের তথ্য তালিকা গলাঃধকরণ করেও, কম্প্যুটার এমন এক খেলার ফর্ক বমি করে যাতে বড় ক্লাবে মহানন্দে লীগের খেলায় আগের বছরের সুবিধাজনক মনগড়া ফিক্সচারটুকু এবারও শুরুতেই পেয়ে যায়। বড় টিমের দু-পক্ষের মুখোমুখির আগে পরের ম্যাচগুলো অদ্ভুত নিয়মে নরম টিমের সঙ্গেই বাঁধা থাকে।

মোহন-ইস্ট-মহমেডানের অঙ্গুলি হেলনে লীগ ম্যাচের রেফারীদের মধ্যে কী অদৃশ্য আলাদা টিম গড়ে ওঠে নি? এখানে কম্প্যুটারে রেফারীর নাম ঠিক হওয়ার বিষয়টি চালু হবে না কেন? পৃথকভাবে বড় তিন ক্লাবের পছন্দসই কয়েকজন রেফারীই প্রায়শঃ গ্রূপে ভাগ হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড় ক্লাবের ম্যাচ করে। এর সঙ্গে নিরপেক্ষতাটুকু গুলিয়ে ফেলি যখন দেখি রেফারি কম সময় খেলাচ্ছে অথবা ভ্রান্তি বিলাসিতায় ভুগছে।

ময়দানে ধন্যবাদহীন কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদন করার জন্যেই রেফারীর ম্যাচপিছু মজুরী মাত্র সাত টাকা। সেই রেফারীরা কিন্তু সাংগঠনিক দিক থেকে হেঁসেল দু-ভাগ করে ময়দানের এক কোণে পড়ে রয়েছে। এদের উত্থান পতনের ভাগ্যের সুতোটি কিন্তু সেই বড় ক্লাবের বাতিল হওয়া কর্মকর্তার সমাবেশে গঠিত আই. এফ. এ দফতরে বাঁধা।

বাঁশি মুখে মাঠে তারা বড় ক্লাবের চোখে অসহ্য হলেই তাদের উপর বাতিলের খাঁড়া নেমে আসে। বেচারা রেফারী কারও মন জুগিয়ে চলে না, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'বেচারা' শব্দটি প্রয়োগে একটু বিশেষ কাতরতা রয়েছে, কেননা বড় টিমের খেলা পরিচালনার সময় সে হাজার তিরিশ বড় ক্লাবের নজরে চলমান বন্দী দশায় কাটায় অতঃপর মাঠের বাইরে জীবনযাত্রারও ওই বন্দীশালা লক্ষ লক্ষ্যের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে যে কার স্বার্থ বজায় রাখতে হবে তা তাদের অজানা নয়।

বড় ক্লাব অথবা তার নামজাদা প্লেয়ার ও কোচ কী ভরপুর আত্মবিশ্বাসে অটল রয়েছে। ম্যাচের আগে পরে তাহলে পূজার্চনা—জ্যোতিষীর প্রভাব দিনে দিনে বাড়ছে কেন? কোনও কোনও কোচের বুক চিরে দেবতার সামনে রক্ত দেওয়া, লাল গেঞ্জির প্রতি অনুরাগ অথবা তুঁতে রঙের জামা পরে মাঠে নামার ঝোঁক দেখা যায়। বড় ক্লাবের টুকিটাকি খরচের ফর্দে দিনে দিনে লিউকোপ্লাস্টারের ব্যবহার বাড়ছে। একটু ভাল রকম লক্ষ্য করলেই দেখবেন মাঠে বড় ক্লাবের প্লেয়ারের আঙুলগুলো কী সব পট্টি দিয়ে যেন মোড়া থাকে। পট্টি দিয়ে আসলে আড়াল করা থাকে নীলা—চুনী—গোমেদ—মুক্তো সব হাজার হাজার টাকার পাথরগুলো। নামজাদা প্লেয়ারদের আত্মবিশ্বাসের ঘুনসি হল ওই দামী পাথর টাথর। কমজোরি টীমের সঙ্গে জেতায় ওদের হাঁকপাক বড় খেলো লাগে। যখন দেখি হাজার সমর্থক পুষ্ট হয়ে, রেফারির প্রতি মাঠের মাঝে অশ্রাব্য ভাষায় সম্বোধন করতে করতে ওরা দুর্বল দলের প্লেয়ারকে নৃশংসভাবে তেড়ে যাচ্ছে। এই বাহাদুরি ক্লাবের ড্রেসিং রুম পর্যন্ত পৌঁছয় যখন দেখি ক্লাব কোচই বিভিন্ন ভাবে ওইসব সমর্থকের নয়নমণি প্লেয়ারদের দ্বারা হচ্ছে। অপদস্থ এখনও কোচ নাকি কোনও ক্লাবেরই আত্মীয় নয়! কর্মকর্তারা তাই প্লেয়ারের গরম মেজাজ সহ্য করে স্থির লক্ষ্যকে সম্মান করে—টীমের ভিতর যত অন্যায় হোক, শুধু ট্রফি জেতার খাতিরে সব কিছু সহ্য করা যাক। তা না হলে একের শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বাতিল প্লেয়ার পরের বছর অন্য ক্লাবে গিয়ে আদর পায়।

দেখতে দেখতে মাঠের বাইরে দূরে একদম টঙে কাচের বা কাঠের ঘরে বসা গম্ভীর বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও কী এই আপাতঃ সাম্প্রদায়িক হাওয়া সংক্রামিত হচ্ছে? ওরা কে কোন দলের সমর্থক এ নিয়ে পাঠক মহলে একটা বিরাট কৌতূহল থাকেই। সমর্থন কোন্ বকযন্ত্র চুঁইয়ে নেমে আসে ঠাওর করা মুশকিল। তবে ওঁদের প্রত্যেকের নির্দ্বিধ—সাংবাদিক কখনও কারও আজ্ঞাবহ হতে পারে। কলম হাতে তার পক্ষে কারও পক্ষ নেওয়া সম্ভব নয়। তবুও অনেকেরই অভিযোগ লেখার ঢং যেন কোনও দিকে ঝুঁকছে? এটা বোধহয়ে উগ্র সমর্থকের আত্মসঙ্কলন।



আঙুলে প্লাস্টারে ঢাকা—পলা, নীলা, গোমেদ

এসবের চেয়েও আশ্চর্য লাগে যখন শুনি লালবাজার কনট্রোল রুম তীর্থের কাকের মত বড় টীমের গোল হওয়ার দিকে বিকালভর চেয়ে যাচ্ছে। সবই শান্তি রাখার দোহাই। শান্তি রক্ষার জন্য কী ফুটবলের উচিত স্বার্থ জবাই হচ্ছে না, নাকি ফুটবল ছাড়া রাজ্যে অশান্তি নেই!

পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট দেশগুলোই নাকি খেলাধুলায় অগ্রণী দেশ। ওলিম্পিকে সোভিয়েত, পূর্ব জার্মান, চেক, কিউবা দলের জয়জয়কার সুবিদিত। এই রাজ্য কম্যুনিষ্ট চিন্তাসম্পন্ন বাম রাজনীতির ছায়ায় বছর তিন অতিবাহিত করেছে। তৎপরতাকে মূলধন করে ময়দানের উপরতলার ফুটবল যেভাবে মরশুমের পর মরশুম করছে, সে বিষয়ে শুধু শান্তিরক্ষার দোহাইয়ে সুচারু পুলিশী ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব বোঝা এড়াবেন। সরকারী হস্তক্ষেপ অ্যামেচারের খেলায় হওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু কলকাতার উপরতলার ফুটবলকে কী অ্যামেচারের সতীলক্ষ্মী হিসেবে দাবি করা যায়।

ফুটবল খেলার নিয়ম ও আইন — রেফারী

কোনাকুনি প্রথায় রেফারী ও লাইন্সম্যানের সহযোগিতা ও নিয়ম সম্পর্কে পাঁচটি ডায়গ্রাম 'খেলার কথায়' আগে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল বাকি ছয়টি ডায়গ্রাম।

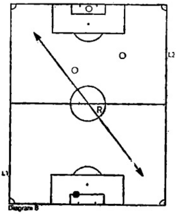
গোল-কিক

রেফারীর (আর) অবস্থান হবে মধ্য-মাঠে কোনাকুনি রেখার নিকটবর্তী স্থানে।

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১) পেনাল্টি এরিয়া বরাবর থেকে গোল-কিক করার দিকে নজর রাখবেন।

দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) থাকবেন দ্বিতীয় শেষ ডিফেণ্ডারের লাইনে, যাঁরা গোল-কিক করছেন তাঁদের সম্ভাব্য আক্রমণের গতি অনুসরণের জন্য।

ডায়গ্রাম—৬



গোল-কিক

মধ্য-মাঠের ফ্রি-কিক

(কালো বিন্দু বল, গোল ক্রসচিহ্ন আক্রমণ দলের খেলোয়াড়, গোল চিহ্ন রক্ষণ দলের খেলোয়াড়।)

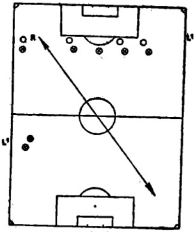
ফ্রি-কিকের জন্য দুই দলের খেলোয়াড়রা যেখানে প্রতিরোধব্যূহ ও আক্রমণের লাইন তৈরি করেছেন রেফারী (আর) ও দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) সেই লাইনের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন অফ-সাইড ও ফাউলের ঘটনা নিরীক্ষণের জন্য।

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১), ফ্রি কিক যেখান থেকে করা হচ্ছে সেখানকার কাছাকাছি জায়গা থেকে দেখবেন ঠিক জায়গা থেকে ফ্রি-কিক করা হচ্ছে কিনা। সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের জন্যও এক নম্বর লাইন্সম্যানের ঐ জায়গায় থাকা প্রয়োজন।

পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে,
গোলের কাছের ফ্রি-কিক

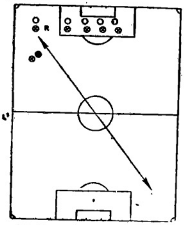
(গোল কালো বিন্দু বল, গোল ক্রস চিহ্ন আক্রমণ দলের খেলোয়াড়, গোল চিহ্ন রক্ষণ দলের খেলোয়াড়, 'আর' রেফারী।)

ডায়গ্রাম—৭



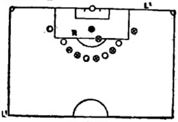
মধ্য-মাঠের ফ্রি-কিক

ডায়গ্রাম—৮



পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে, গোলের কাছের ফ্রি-কিক

ডায়গ্রাম—৯



পেনাল্টি-কিক

এই ধরণের ফ্রি-কিকের সময় রেফারী তাঁর কোনাকুনি রেখা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান করবেন যাতে অফ-সাইডের ঘটনা তিনি খুব ভালভাবে বিচার করতে পারেন।

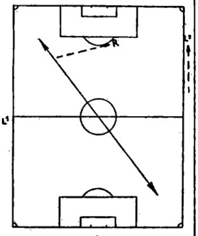
দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) রেফারীর অবস্থান থেকে আরও একটু এগিয়ে থেকে অর্থাৎ গোল-লাইনের সঙ্গে থেকে অফসাইড ও ফাউলের ঘটনার প্রতি নজর রাখবেন এবং ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হলে বল গোল-লাইন অতিক্রম করে কিনা তার প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন।

পেনাল্টি-কিক

পেনাল্টি কিকের জন্য বল বসান হয়েছে গোল-লাইনের উপর গোলকিপার এবং কিক করবার জন্য প্রস্তুত কিকার ছাড়া আক্রমণ ও রক্ষণ দলের খেলোয়াড়রা যথারীতি পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে এবং পেনাল্টি বিন্দু থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়িয়েছেন। 'আর' চিহ্ন স্থানে রেফারী অবস্থান করলে তিনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন, ঠিকভাবে কিক করা হচ্ছে কিনা এবং কিকের আগে কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ছেন কিনা।

এল-২ স্থানে দুই নম্বর লাইন্সম্যান অবস্থান করে নজর রাখবেন, গোল-কিপার কিকের আগে বে-আইনীভাবে গোল-লাইনের উপর থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন কিনা এবং পেনাল্টি কিক গোল-লাইন অতিক্রম করে কিনা।

ডায়গ্রাম—১০-'এ'



থ্রো-ইন

এল-১ স্থানে এক নম্বর লাইন্সম্যান অবস্থান করে সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের গতির দিকে নজর রাখবেন।

থ্রো-ইন

বল খেলার বাইরে গেলে অর্থাৎ থ্রো-ইন হলে দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) কাদের থ্রো-ইন সেটা নির্দেশ করে দেবার জন্য বলের কাছাকাছি থাকবেন।

রেফারী (আর) তাঁর কোনাকুনি পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে সরে যাবেন ঠিক যেভাবে রক্ষণ দলের খেলোয়াড়রা থ্রো-ইনের জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে যান।

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১) মাঠের মধ্য রেখা বরাবর দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের গতির দিকে লক্ষ রাখবেন।

থ্রো-ইন

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১) থ্রো-ইনের জায়গা থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এখান থেকে বল নিক্ষেপ-কারীর পায়ের ত্রুটি লক্ষ করবার অসুবিধা নেই। কাদের থ্রো

রহিম সাহেব

প্রদীপ ব্যানার্জী

হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোশ্লাভিয়া ভারতকে ১০—১ গোলে হারিয়েছিল। চারবছর বাদে ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে সেই ব্যবধান কমে এসে দাড়ায়, যুগোশ্লাভিয়া—৪ : ভারত—১। 'লণ্ডন বা হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সঙ্গে মেলবোর্ণের ভারতীয় দলের তফাৎ অনেকখানি'—উইলি মিজোর এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ১৯৫৬ সালে ভারত মেলবোর্ণে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। অলিম্পিকে ভারত এর আগে কোন দিন জিততে পারেনি। মেলবোর্ণে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল—অস্ট্রেলিয়াকে ৪—২ গোলে হারিয়ে। সেই ম্যাচে হেরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া টীম ভীষণ ক্ষেপে গেল। ওরা বলল—'ইওরোপের লীগে ব্যস্ত থাকায় দেশের প্রথম সারির ফুটবলাররা মেলবোর্ণ যেতে পারেনি। পুরো টীম থাকলে ভারত কখনো পারত না।' ঠিক তার পরেই সিডনীতে দু-দেশের মধ্যে এক প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়। আনন্দের কথা সিডনীতে সেই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায়, ভারত—৭ : অস্ট্রেলিয়া—১। সে ম্যাচে আমি হ্যাটট্রিক করেছিলাম। খেলার পর এক প্রীতি ভোজের আসরে অস্ট্রেলিয়ার কর্মকর্তারা স্যর স্ট্যানলি রাউজকে জিজ্ঞেস করলেন : 'হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে টু ডেভলপ ইন ফুটবল অ্যাণ্ড হাউ।' উত্তরে স্ট্যানলি রাউজ বললেন—'ওয়াচ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ফলো ইণ্ডিয়া।'

রহিম সাহেব হেলসিঙ্কিতে থাকতেই ইওরোপীয়ান ফুটবলকে লক্ষ্য করেন। তাঁর সবচেয়ে ফেভারিট ছিল হাঙ্গেরীয়ানরা। ভদ্রলোক বড্ড বেশি হাঙ্গেরী প্রেমে পড়েছিলেন। অবশ্য সেটা হবারই কথা। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান সুইডেন ১৯৫২তে হেলসিঙ্কিতে এসে মাথা তুলে দাড়াতে পারলনা হাঙ্গেরীর সামনে। প্রথম ম্যাচে সুইডেন বুঝতেই পারেনি যে হাঙ্গেরী কতটা তৈরী হয়ে এসেছে। একদম শুরুতে কিক্‌অফ থেকে বল পেয়ে পুসকাস সার্কেলের মধ্যে থেকে কামান দাগানো শটে সুইডেনের জান নড়িয়ে দেন। তারপর আরও পাঁচ গোল। সুইডেন ৬—০ গোলে হেরে গেল। রহিম সাহেব সেই ম্যাচ দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, হাঙ্গেরী নতুন ধাঁচে ফুটবল খেলছে। স্ট্রাইকারের একজনকে একটু পিছিয়ে এনে ওরা খেলছিল। রহিম সাহেবের গুণ ছিল, নতুন কোন ভালো জিনিষ দেখলেই সেটাকে ধরতে চাইতেন। তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি এত স্বচ্ছ ছিল, যে কোন ভালো জিনিষ তাঁর নজর এড়াতে পারতনা।

শুধু সুইডেনকে নয়। ইংলণ্ডকেও হাঙ্গেরী কিছু দিন পরে ভালো শিক্ষা দেয়। একবার ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ৬—৩ গোলে। অন্যবার বুদাপেষ্টে ৭—১ গোলে হারিয়ে। এইভাবে হাঙ্গেরী রহিম সাহেবের মন জয় করে নেয়। রহিম সাহেব সব সময়েই বলতেন 'হাঙ্গেরীর মতো খেলতে হবে।'

নতুন কোন পরিকল্পনা হাতে নিতে হলে কোচকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। আর ভারতবর্ষেতো নতুন কাজে হাত দেওয়া সবসময়েই বিপজ্জনক। রহিম সাহেব জানতেন, যত দিন না তাঁর হাতের ছেলেরা তৈরি হচ্ছে ততোদিন তিনি নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারবেন না। সেই কারণে হেলসিঙ্কিতে তিনি চুপ করে ছিলেন। শুধু সুযোগ খুঁজছিলেন।

সে সুযোগ এসে গেলে ১৯৫৬তে। রহিম ভারতের কোচ নির্বাচিত হলেন। অন্যদিকে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিনিধি। তাঁর একার দু-টি ভোট, সেই সঙ্গে তাঁকে সমর্থন জানালেন শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষ গুহ, মিঃ জিয়াউদ্দিন এবং এম দত্তরায়। সিলেকশনে তাঁর জোর বেড়ে গেল। পুরনো প্রায় সবইকেই তিনি টীম থেকে বাদ দিলেন। নিয়ে এলেন অনেকগুলো নতুন মুখ। সবাই তাজা-তরুণ, সবাই তাঁর কথা শুনত। তাদেরকে নিয়েই রহিম সাহেব এগোতে লাগলেন। হাঙ্গেরীর ন্যায় তিনিও ৩—২½—৪½ প্রথায় টীমকে খেলালেন। প্রথমে নেভিল ডি সুজা-কে দিয়ে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি সফল হননি। কিন্তু পরে নিখিল নন্দীকে দিয়ে ফল পেয়েছিলেন।

এই যে নতুন নতুন চিন্তাধারা এই গুণ কোচের মধ্যে না থাকলে তিনি কখনো দেশের কাজে আসতে পারেন না। রহিম সাহেবের সে গুণ ছিল। টীমের স্বার্থে তিনি ঝুঁকি নিতে পিছ-পা হতেন না।

নিখিল নন্দীকে খেলাতে গিয়ে তিনি টীমের ক্যাপ্টেন সমর ব্যানার্জী (বদ্রু)কে ও বাদ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

তাঁর সময়ে যে কোন দেশের বিপক্ষেই ভারত আগের চাইতে ভালো ফল পেয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার কথা আগেই বলেছি। ১৯৫৪ সালে ইন্দোনেশিয়া ভারতকে ৪—০ গোলে হারায়। ১৯৫৮-তে হারায় ৪—১ গোলে। তারাই রোম অলিম্পিকের প্রাক পর্যায়ে ভারতের কাছে পরপর দু-বার হেরে বিদায় নেয়। প্রথমে কলকাতাতে ৪—২ গোলে। পরে ওদের দেশে ২—০ গোলে। এরপর রোমে ভারত আশাতীত ভালো খেলে। সে সময় গোটা বিশ্বের সব কটা দেশ ফুটবলে দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তখনো ভারত কিন্তু তাদের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি ম্যাচে আমরা গোল করেছিলাম। দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরী আমাদের হারাতে রীতিমত বেগ পেয়েছিল। নব্বই মিনিট লড়াই করে আমরা সে ম্যাচে ২—১ গোলে হেরে যাই। হেলসিঙ্কিতে ফ্রান্স ভারতকে হারিয়েছিল। রোমে কিন্তু তারা ভারতকে হারাতে পারেনি। ফলাফল ১—১ ছিল। এক কথায় অনেক পিছিয়ে থাকা ভারতকে ফুটবলে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন রহিম সাহেব।

১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে তার প্রতিশ্রুতি মিলেছিল। দেশের ফুটবলের কর্ণধাররা যদি সেটা ভালোভাবে গ্রহণ করতেন তাহলে ভারত ১৯৬০ সালে আরও ভালো ফল পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য 'রহিম' সাহেবের, দুর্ভাগ্য আমাদের যে সে সুযোগ তাঁরা দেননি।

১৯৫০-র এশিয়ান গেমসে কথা উঠল দেশে আরও অনেক কোচ আছেন তাদেরকেও সুযোগ দিতে হবে। কথাটা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই হাসবেন। যাইহোক কর্তারা যেটা ভাবেন সেটাকে না করে ছাড়েন না। অতএব রহিম সাহেবকে চলে যেতে হল। সেদিন যদি তিনি কোচ থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হত। টানা একটা টীমকে নিয়ে চলতে পারলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। রহিম সাহেবকে সেদিন সরিয়ে দেশের কোন লাভ হয়নি—বরং ক্ষতি হয়েছিল।

তবু তিনি দমেন নি। কিছুতেই যেন হারতে চাইতেন না। আবার ১৯৬০-এ তাঁকে ডাকা হয়। সেবারের ফলাফল আগেই বলেছি। এবারেও তিনি হাঙ্গেরী ধাঁচে খেলিয়েছিলেন। কাননকে একটু পিছিয়ে খেলান।

১৯৬২-র এশিয়ান গেমস-এ ভারত সোনা পাবে এটা অনেকেই ভাবেননি। লীগ ম্যাচে দঃ কোরিয়া ভারতকে হারায়। কিন্তু ফাইনালে তাকেই হারতে হয় ভারতের কাছে। এশিয়ান গেমস-এ সোনা আগেও পেয়েছি। তবে বিদেশের মাটিতে এতবড় সাফল্য এই প্রথম। এর পিছনে যে মানুষটির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তিনি হলেন রহিম সাহেব।

আগেই বলেছি রহিম সাহেব ঝুঁকি নিতে বড় ভালো বাসতেন। আর টীমে নতুন মুখ বেশি করে চাইতেন। ১৯৬২ সালে বেশ কটা নতুন মুখ টীমে ঢুকল। প্রদ্যোত বর্মন, প্রশান্ত সিন্‌হা, ত্রিলোক সিং, এথিরাজ, অরুময়নৈগম এই সব নতুন ছেলেরা রহিম সাহেবের মন জয় করে নিয়েছিল।

কেম্পিয়ার মতো অভিজ্ঞ বর্ষিয়ান হাফ ব্যাককে টীম থেকে বাদ দিতে রহিম সাহেব একবারও দ্বিধাবোধ করেন নি। রামবাহাদুরকে বসিয়ে ফ্রাংকো—প্রশান্তকে হাফে খেলিয়েছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে জার্ণেল সিং-কে সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে তিনিই আবিষ্কার করেন। 'জার্ণেল' সেবার বেশ কটা গোলও করেছিল। ফাইনালেও জার্ণেল সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলেছিল। তার পরে কলকাতা মাঠেও আমরা কিছুদিন ওকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে দেখেছি। (চলবে)

হায় ! ভারতীয় হকি

গুরবক্স সিং

এই মাসের গোড়ায় সন্ত সমাপ্ত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা দেখে আবার হতাশ হতে হল। বিগত বেশ কটি প্রতিযোগিতায় যেমন নতুন মুখ দেখতে পাইনি এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। আঙুলে গুণতে পারা যায় এমন কটি সামান্ত সংখ্যক ইয়ং-স্টার চোখে পড়লেও, আমার দুঃখ সেই সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়। প্রতি পজিশনে পাঁচ থেকে ছ'জন নতুন মুখ এখনই প্রয়োজন যদি আমাদের আন্তর্জাতিক মাণের ভাল জাতীয় দল গঠন করতে হয়।

গোলকিপিং : এই পজিশনে সমস্ত পুরনো মুখগুলো আবার ভেসে উঠল, যেমন—এলানগোয়েফিল্ড, ছাবড়া, ফারনানডেজ ও অশোক দেওয়ান। এদের মধ্যে শেষোক্ত খেলোয়াড়টি সব চাইতে ভাল।

লেফট ব্যাক : সুরজিৎ এই আসরে অনুপস্থিত ছিল। করাচীতে আহত হবার জন্ত সে খেলতে পারেনি। একমাত্র রাজীন্দর সিং-এর সামান্ত উন্নতি দেখলাম।

রাইট ব্যাক : করাচী মাঠে শর্ট কর্ণার স্পেশালিস্ট দেবীন্দর সিং এই আসরে অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ পাঞ্জবদল এই আসরে উপস্থিত ছিল না। এই ঘটনা আমাকে খুব অবাক করেছে যে, পাঞ্জাব, বি. এস. এফ. ও পুলিশের খেলোয়াড় না পেয়ে একটা দল গঠন করতে সমর্থ হল না। যেহেতু-ইণ্টার, পুলিশ দলের খেলা পুনাতে চলছে সেহেতু পাঞ্জাব দল পাঠাল না। ডুং ডুং ও বাটলা দু জনেই হার্ড হিটার কিন্তু ট্যাকলিং ও পজিশনিং-এ এখানো ঘাটতি পূরণ করে উঠতে পারেনি। উত্তর প্রদেশের ভাণ্ডারী ও হার্ডহিটার।

আমাদের ফুল-ব্যাকদের খেলা দেখে মনে হয় ওরা বুঝি—ট্যাকল, পজিশন, পুশ, ফ্লিক, স্কুপ এসব হকির মূলমন্ত্রগুলো ভুলে গেছে।

রাইট হাফ : কোনও আউটস্ট্যাণ্ডিং খেলোয়াড় আমার চোখে পড়ল না। তবে বোম্বের সোমাইয়াকে অন্তদের তুলনায় ভাল বলে মনে হল।

সেণ্টার হাফ : রবিন্দার পাল ভারতীয় দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে। দীর্ঘকায় সুস্বাস্থের অধিকারী এই খেলোয়াড়টির ভাল হিট আর স্কুপের অভাব আছে। এই দুটো দিকে নিজেকে তৈরী করে নিতে পারলে ভবিষ্যতে ভারতীয় দলের অপরিহার্য্য খেলোয়াড়। এই পজিশনে আর দু জনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তারা যথাক্রমে কর্ণাটকের শ্যাপি ও ভুপালের মুমতাজ।

লেফট হাফ : ভাস্করণ সকলের থেকে ভাল খেললেও একটা ভুল খুব চোখে পড়ে ও যখন এ্যাটাকিং-এ যায় তখন ডিফেন্স করবার ব্যাপারে যে প্রয়োজন আছে নেমে আসবার সেটা ভুলে যায়। এছাড়া এ পজিশনে মোটামুটি নাম করা যায় এয়ারলাইনসের গুরচরণ, বাংলার দুপার, সার্ভিসেস দলের রামান্না ও উত্তরপ্রদেশের মুকেশ।

আউট সাইড রাইট : পাঞ্জাবের চরণজিৎ সিং ও রেলের ফিলিপের অনুপস্থিতিতে থাকে সবচাইতে ভাল বলে মনে হল সে বোম্বের কৌশিক, তাছাড়া এয়ার লাইনসের গুরুচরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেঙ্গাপ্পা।

ইনসাইড রাইট : ভারতীয় দলের বর্তমান দুই ফরোয়ার্ড অশোক ও ফারনানডেপ ভীষণ ভাল খেলেছে। নতুনদের মধ্যে রেলের বোরা, ভুপালের সেলিমকে ভাল লাগল।

সেণ্টার ফরোয়ার্ড : এয়ার লাইনসের গ্রেওয়ালকে খুব ভাল লাগল। গত বছরের থেকে অনেক উন্নতি করেছে। বল দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে দক্ষতা দেখাতে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পুরনো খেলোয়াড় বলবীর সিং এই আসরের তিনটি দর্শনীয় গোলের মধ্যে দুটো করেছে। এখনো প্রমাণ করছে যে সে যদি বল নিয়ে দৌড়তে শুরু করে কেউ স্পীডে বলবীরকে ধরতে পারছে না। ভারতের চারজন সেরা গোলকীপারের তিনজনের বিরুদ্ধেই ও গোল করতে সক্ষম হয়েছে।

আউট সাইড লেফট : তিনজন খেলোয়াড়কে এই পজিশানে খুব ভাল খেলতে দেখা গেল। এয়ারলাইনসের এম. ফারনানডেজ উত্তর প্রদেশের সহিদ ও ভুপালের ইউসুফকে। তিনজনেরই বল কণ্ট্রোল এবং ডিস্ট্রিবিউশন খুবই প্রশংসনীয়। এছাড়া যাদের নাম করা যেতে পারে উত্তরপ্রদেশের—সৈয়দ আলী, বাংলার বলবিন্দার সিং।

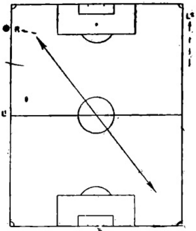
শম্ভু মুখার্জী স্মরণে

দীর্ঘদিন ময়দানে ফুটবল খেলেছেন শম্ভু মুখার্জী। খেলতেন ইনসাইড ফরোয়ার্ডে। বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন কলকাতা এরিয়ান ক্লাব এবং জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবে। তখন অবশ্য নক আউট টুর্ণামেণ্টে অন্ত ক্লাবে থেকেও খেলা যেত। যে হিসেবে শম্ভু-দা মোহনবাগানের হয়ে বেশ কটা টুর্ণামেণ্টেও অংশগ্রহণ করেছেন।

এ ছাড়া সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের হয়ে খেলেছেন। ভারতীয় দলের হয়ে অলিম্পিক ট্রায়ালেও ডাক পেয়েছিলেন।

খেলা ছাড়ার পরও কিন্তু তিনি ময়দানকে ভোলেন নি। ময়দানে রোজ একবার তিনি না এসে পারতেন না। শেষ দিকে জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। বেশ ক-বছর ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারী পদে ছিলেন। মৃত্যু-সময়েও তিনি ছিলেন ঐ ক্লাবের সহ সভাপতি।

ডায়গ্রাম—১০-'বি'



থ্রো-ইন

সেটাও তিনি নির্দেশ করতে পারেন। তা ছাড়া সম্ভাবিত প্রতি আক্রমণের জন্যও তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

রেফারী (আর) তার কোনাকুনি রেখা থেকে টাচ-লাইনের দিকে একটু সরে গিয়ে থ্রো-ইনের অন্য ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করবেন।

দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) অন্য ঘটনার প্রতি নজর রাখবেন, যতক্ষণ রেফারী তার কোনাকুনি রেখায় ফিরে না আসেন।

প্রশ্নের উত্তরে

গোপাল বোস

কলকাতা থেকে প্রহ্লাদ ঘোষ, জলপাইগুড়ি থেকে সুকল্যাণ মৈত্র ও রাঁচি থেকে সমর ব্যানার্জী।

প্রঃ আপনি কার অনুপ্রেরণায় ক্রিকেট খেলা শুরু করেন?

উঃ কারো না। আমি, নিজেই ক্রিকেট ভালবেসেছি, একা একাই শুরু করেছি।

জামসেদপুর থেকে বনমালী রায়, শান্তিপুর থেকে অনিতা বোস ও কলকাতা থেকে অনুপম ও অরিজিৎ দাশগুপ্ত।

প্রঃ কোন স্কুলে ও কলেজে পড়েছেন?

উঃ আমি সেন্ট-জাভিয়ার্স স্কুলে ও হেরম্ব চন্দ্র কলেজে পড়াশোনা করেছি।

রাণীগঞ্জ থেকে প্রনতি ও শ্যামলী লাহা, কলকাতা থেকে সমীরণ ব্যানার্জী ও বুদ্ধদেব বসুমল্লিক।

প্রঃ আপনার আদর্শ ক্রিকেটার কে?

উঃ সত্যি কথা বলতে আদর্শ ক্রিকেটার বা শ্রদ্ধা করি এমন ক্রিকেটারের নাম বলতে বললে খুব সামান্য নাম আসে। তবে আমার সুনীল গাভাসকারকে ভাল লাগে। একবার ১৯৫৮তে সোবার্সকে দেখেছিলাম তখন কতটুকু আর বুঝতাম।

অণ্ডাল থেকে অরূপ, শ্রীরূপ ও বাবু। কলকাতা থেকে সুনীল, মল্লিকা বোস, বন্যা দত্ত, নীপা ও বিপ্লব মজুমদার।

প্রঃ ভারতীয় দলে আপনাকে না খেলানোতে, আপনি কি কাউকে দোষারোপ করেন?

উঃ না।

প্রঃ আপনি কোন (ফুটবল) দলের সমর্থক?

উঃ ফুটবল প্রায় দেখি না বললেই চলে। তাই সমর্থন করি না বললেও চলতে পারে।

প্রঃ আপনার প্রিয় ফুটবলার কে?

উঃ সুধীর কর্মকার।

মাইথন ড্যাম থেকে চন্দন দাশগুপ্ত, অনুপম সেনগুপ্ত, বাবলা এবং স্বপ্না বৈদ্য।

প্রঃ ভারতীয় দলের হয়ে কবে, কবে বাইরে গেছেন?

উঃ ১৯৭৩-৭৪ এ সিংহল ও ১৯৭৪ এপ্রিলে ইংল্যাণ্ড।

মানকর থেকে বাণীব্রত ও সুব্রত আচার্য। কলকাতা থেকে বাপী ও বাবু।

প্রঃ ভারতীয় দল সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?



উঃ এখন দলে যারা আছেন, ঠিকই আছেন। দু'জনকে নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বনাথকে ভাল ফর্মে থাকতে হবে, না হলে সমূহ বিপদ মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান নিয়ে। পাশাপাশি সন্দীপ পাতিল কতটা দলকে সাহায্য করতে পারবে সেটাও আলোচ্য ও দেখবার বিষয়। এছাড়া দলে স্পিনার বলতে দিলীপ দোশী। নতুন স্পিনারদের মুখ দেখা যাচ্ছে কম।

কোন্নগর থেকে অরূপ রতন আইচ। কলকাতা থেকে কৃষ্ণা, ঝুমা ও কুমকুম।

প্রঃ আপনার খেলোয়াড়ী জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি?

উঃ সেদিন যখন শুনলাম আমি ভারতীয় দলে সুযোগ পেলাম।

হাওড়া থেকে নরেন্দ্রনাথ সরকার, রামেন্দ্র সরকার ও গৌতম চৌধুরী কলকাতা থেকে অজয় ও চন্দন।

প্রঃ আপনারা জীবনের সেরা ম্যাচ কোনটি?

উঃ ইরানী ট্রফিতে, বোম্বাইএর বিরুদ্ধে ১৯৭৩-৭৪ এ বাঙ্গালোরে।

প্রঃ বাংলা দলে প্রথম কবে খেলেছেন?

উঃ ১৯৬৮-৬৯এ বিহারের বিরুদ্ধে।

গোবর্দ্ধনপুর থেকে সুশান্ত বিশ্বাস ও প্রান মণ্ডল। কলকাতা থেকে রনজিত দাস। বর্ধমান থেকে মানব ও রাজকুমার মিত্র।

প্রঃ আপনার রনজি ট্রফিতে সেরা ম্যাচ কোনটি?

উঃ ১৯৭৩-৭৪এ জামসেদপুরে বিহারের বিরুদ্ধে ১৬৯ নঃ আঃ।

প্রঃ আপনার জীবনে সর্বোচ্চ রান কত?

উঃ বাঙ্গালোরের খেলাতে আমি ১৭০ করেছিলাম।

চন্দননগর থেকে ডালিয়া রায়, নৈহাটী থেকে খুকুমনি ও পাপড়ি কলকাতা থেকে অলোক চক্রবর্তী।

প্রঃ আপনার প্রিয় বোলারদের নাম জানান?

উঃ মিডিয়াম পেস—সুব্রত গুহ।
স্পিন—শিভালকর ও প্রসন্ন।

প্রঃ যখন ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ান তখন কি নার্ভাস মনে করেন?

উঃ আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সব ব্যাটসম্যানই এক উত্তর দেবেন। প্রথমে নামবার সময় কিছুটা চিন্তা মাথায় থাকলেও উইকেটের সামনে দাঁড়ালে সব ভুলে গিয়ে বলের কথাই মনে হয়।

দত্ত পাড়া থেকে তরুন ও অরুন ঘোষ। হাওড়া থেকে মনোজ। কলকাতা থেকে মানিক ও পলাশ।

প্রঃ আপনি দিনে কত ঘণ্টা অনুশীলন করতেন?

উঃ ভাল ক্রিকেটার হতে হলে আমার ধারনা দিনে ৪/৫ ঘণ্টা অনুশীলন করতেই হবে।

কলকাতা থেকে দীপা ও নীপা চক্রবর্তী।

প্রঃ অবসর সময়ে কি ভাবে কাটান?

উঃ টেলিভিশন দেখে ও বই পড়ে।

কলকাতা থেকে তুষার দাশগুপ্ত, সমরজিৎ সুব্রত কুণ্ডু, বিমান বোস, প্রানময় লাহিড়ী।

প্রঃ ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলী সম্বন্ধে আপনার কি ধারনা?

উঃ যারা নির্বাচন করেন তার যে, সব সময় ঠিক করেন তা আমি বলছি না। উল্টে আমি বলতে চাই দল নির্বাচনে যদি অধিনায়কের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া যায়, তবে দেখা যায় তার ফল ভাল হয়। ইয়ান চ্যাপেল দল তৈরী করতেন, সুনীল গাভাসকারও করেন। এতে সুবিধা এই যে দলের দুর্বলতাগুলি জেনে সেই জায়গাতে কাকে নিলে ভাল হতে পারে এটা সবচাইতে ভাল বোঝেন মাঠে যারা খেলেন তারা। সেই হিসেবে নির্বাচক মণ্ডলীর নির্বাচনকেই যে বিরাট গুরুত্ব দিতে হবে তার প্রয়োজন নেই।

বহরমপুর থেকে নারায়ন ঘোষ; আসানসোল থেকে কাকলি ও বুলোন। কলকাতা থেকে গৌতম, অরুন, গোবলা ঘোষ।

প্রঃ বিশ্ব একাদশ তৈরী করে দিন?

উঃ গাভাসকার, গ্রীনিজ, ভিভ. রিচার্ডস, গ্রেগ চ্যাপেল, বিশ্বনাথ, ইয়ান বোথাম, কিরমানি, লিলি, রিচার্ডস হ্যাডলি, দিলীপ দোশী। এই দলের অধিনায়ক—ইয়ান চ্যাপেল।

কলকাতা থেকে সৌমিত্র, ললিতা দস্তিদার, তারক সাহা ও মুকুল রায়।

প্রঃ আপনি কি বিবাহিত?

উঃ হ্যাঁ। ছেলের নাম—অরিজিৎ

শান্তিনিকেতন থেকে দেবাশিস, বুলবুল বসাক। কলকাতা থেকে মলয়, কিশোর ও রঞ্জিত দে।

প্রঃ আপনাকে চিঠি দেব কোন ঠিকানায়?

উঃ পি—৮০, লেক রোড। কলিকাতা —৭০০০২৯।

অমল দত্ত

আধুনিক ফুটবল

বল শূন্য থেকে এসে যখন মাটিকে ছুঁই ছুঁই করছে, সেই অবস্থায় তাকে কিক্ করাকেই, হাফ-ভলি বলা হয়। এবং এ জাতীয় কিকে, পায়ের ওপরকার সবটুকুই ব্যবহার করা হয়। (এক নম্বর-ছবি)

হাফ-ভলি নেবার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে খেলোয়াড়কে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

(ক) কিক্ নেবার আগে, বলটা কোন জায়গায় পড়ে লাফিয়ে উঠবে (Bounce) সেই সম্বন্ধে পুরোপুরি সঠিক হওয়া এবং বল মাটিকে ছোঁবার আগেই যতদূর সম্ভব খেলোয়াড়ের বল-না-মারা (Nou-kicking foot) পাকে বলের কাছে নিয়ে যাওয়া।

(খ) কিক্ নেবার পর খেলোয়াড়ের পাকে সামনের দিকে বেশী না তোলা (Follow through), কেননা তাতে বলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উঁচুতে উঠে যাবার সম্ভাবনা বর্তমান।

(গ) সর্বদাই বলের মিড-লাইনের উপরের অংশে মারতে হবে।

(ঘ) এ জাতীয় কিক্ নেবার সময়, খেলোয়াড়কে যেমন সর্বদাই বলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, কিক্ করবার পর তার মাথা যেন সামনে অর্থাৎ বলের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে থাকে। (দু নম্বর ছবি)

বেণ্ট ভলি :—



গতবারের 'আধুনিক-ফুটবল' প্রবন্ধে ভলি প্রসঙ্গ আলোচনায় যা লিখেছি—খেলোয়াড়ের কাছে অনুশীলনের সময় তুলনামূলকভাবে তা সহজ মনে হতে পারে; কিন্তু 'বেণ্ট-ভলি' সম্বন্ধে এখন যে বিস্তৃত আলোচনা করতে যাচ্ছি, তার সুরুতেই পাঠককে জানিয়ে রাখি যে এ জাতীয় কিকে, বলকে শূন্যে ঘোরাবার (Swerve) ব্যাপারটা থাকে বলে নিঃসন্দেহে তা কঠিন এবং সুদীর্ঘকাল ধৈর্য্যের সঙ্গে অনুশীলন-সাপেক্ষ।

বেণ্ট-ভলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটির ব্যবহার পায়ের ইনসাইড দিয়ে, তাই তাকে বলা হয়—বেণ্ট ভলি (ইনসাইড ফুট); অপরটি পায়ের আউট সাইড দিয়ে কিক্ করা হয় বলে, বলা হয়—বেণ্ট-ভলি (আউট সাইড ফুট)।

বেণ্ট ভলি (ইনসাইড-ফুট) :

তিন, চার, পাঁচ এবং ছয় নম্বর ছবিগুলিকে ভালভাবে দেখলেই পায়ের ইনসাইড দিয়ে কি করে বেণ্ট-ভলি মারতে হবে—তার সুস্পষ্ট ধারণা খেলোয়াড়ের জন্মাবে।

তিন নম্বর ছবিটিতে দেখানো হচ্ছে—বল যখন খেলোয়াড়টির কোমর বরাবর অর্থাৎ বলে কিক্ করবার সাধ্যের শেষ সীমায়—তখনই খেলোয়াড়টি বলের ওপর চোখ রেখে বেণ্ট-ভলি নেবার জন্য নিজেকে তৈরী করেছে।

চার নম্বর ছবিতে—বলে পা কেমন ভাবে চালাতে হবে তাই দেখানো হচ্ছে। এইখানে বলে রাখি, বিভিন্ন উচ্চতায় বলকে কিক্ করতে হয় বলে, খেলোয়াড়কেও বিভিন্নভাবে তার শরীরের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হয়। যেমন ধরা যাক, বল যখন কিছুটা নীচুতে, তখন বলে পা লাগাবার মুহূর্তে, পাকে পুরোপুরি ছড়ান খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু বল যখন বেশ উঁচুতে, তখন খেলোয়াড়ের পক্ষে পাছার সংযোগস্থল থেকে পায়ের উপরে অংশ দুমড়ে, হাঁটুর সংযোগস্থল থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে কিকিং-এর ক্রিয়ার সূচনা পর্ব সারতে হবে।





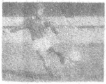
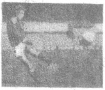



পাঁচ নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে খেলোয়াড় বলের কোন অংশে মারছে। মূলতঃ এ জাতীয় কিকে, বলের একেবারে বাহিরের দিকেই মারতে হবে কিন্তু খেলোয়াড় যদি বলকে উঁচুতে কিংবা বেশ কিছুটা দূরে পাঠাতে চায় তাহলে তাকে বলের কিছুটা নীচের দিকে মারতে হবে।

ছয় নম্বর ছবিতে, পায়ের যে অংশ অর্থাৎ পায়ের চেটোর উপরের দিকে যেখানে বুড়ো আঙুল সুরু হয়েছে দেখানো হচ্ছে সেই জায়গা দিয়েই বলকে মারতে হবে এবং মারবার পর পদাঙ্গুলী (Toes) মাটির দিকে নামান থাকবে।

বেন্ট-ভলি (আউট সাইড-ফুট) ঃ

সাত, আট এবং নয় নম্বর ছবিগুলো দ্বারা, উপরোক্ত ধরনের কিক করবার কায়দাটুকু যাতে খেলোয়াড় সহজেই ধরতে পারে—তারই চেষ্টা করা হচ্ছে।

সাত নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে—বলটা যখন খেলোয়াড়ের কোমর বরাবর, তখন সে বলটিকে ভলি মারবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। এই সময় কিন্তু খেলোয়াড়ের সঙ্গে বলের বেশ কিছুটা দূরত্ব থাকা দরকার—না হলে। কিকিং-এর জন্য পাকে যতটুকু ছড়ানো দরকার, তার জায়গাটুকু সে পাবে না।

আট নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে খেলোয়াড় বলটির একেবারে ভিতরের দিকে মারছে, এ জাতীয় কিকে খেলোয়াড় যদি কিছুটা উঁচুতে কিংবা দূরে বলকে রাখতে চায় —তাহলে তাকে বলের বাইরের অংশেরই কিছুটা ভিতরের দিকে মারতে হবে।

নয় নম্বর ছবিতে খেলোয়াড়ের পা এবং বলের সংযোগস্থলকে দেখানো হচ্ছে। আসলে এ স্থলে পায়ের চেটোর বাইরের দিকে, যেখানে কড়ে আঙুল সুরু হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটুকু দিয়েই বলকে মারতে হবে এবং বলকে মারবার পর, খেলোয়াড় যেন তার পায়ের এ্যাংকেলকে শিথিল না করে করে শক্ত রাখে।

সোয়ার্ভিং দি হাফ-ভলি ঃ

অন্য স্কিলের সঙ্গে সোয়ার্ভিং হাফ-ভলির তফাৎ এই জন্যেই যে এ জাতীয় কিকিং-এ, খেলোয়াড়ের পায়ের সঙ্গে বলের সংযোগ ঘটবার ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এই সময়




একটু ভুল হলেই—সে ক্ষতি পুষিয়ে দেবার মত খেলোয়াড়ের আর কিছু করার অবশিষ্ট থাকে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক—বলটা যখন মাটি ছুঁই ছুঁই করছে, সেই সময়ে পায়ে —বলে না হয়ে, বল কোমর বরাবর থাকা অবস্থায় যদি তাকে মারতে যায় তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ জাতীয় কিক্ মারা হয় সেইটাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই সোয়ার্ভিং হাফ-ভলি ও আবার দু'ধরনের।

পায়ের ভিতর দিকটা দিয়ে মারলে বলা হয়—সোয়ার্ভিং হাফ-ভলি (ইনসাইড ফুট) আর পায়ের বাইরের দিকটা দিয়ে মারলে—সোয়ার্ভিং হাফ-ভলি (আউট সাইড ফুট)।

সোয়ার্ভিং হাফ-ভলি (ইনসাইড ফুট)

১০ নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে খেলোয়াড় যে মুহূর্তে বল মাটিতে পড়ছে, তখনই উপরোক্ত কিক্ করবার জন্য উপযুক্ত জায়গা নিয়েছে। এইখানে জানিয়ে রাখি, বল সিধেসিধি কিংবা বাম অথবা ডান দিক থেকে কোনাকুনি, অথবা পিছন দিক থেকে। খেলোয়াড়ের মাথা টপকে সামনে এলেও - উপরোক্ত ধরনের কিকের অনুশীলন সম্ভব। তবে জায়গা বেছে, কিক্ করবার প্রস্তুতির ব্যাপারটা সবক্ষেত্রেই সমান



গুরুত্বপূর্ণ।

১১ নম্বর ছবির বিশ্লেষণের আগে, উপরোক্ত কিক্ প্রসঙ্গে বলি—বল যখন মাটিতে পড়ছে, তখন খেলোয়াড়ের শরীর যেন সেই বল থেকে বেশী দূরে না থাকে এবং তার শরীরটাও যেন পিছনে হেলে না থাকে এবং কিক্ করবার জন্য তার পাকে বেশী পিছন দিকে টানবারও কোন দরকার নেই। দাঁড়ানো পা, বলের পিছনে থাকবে বটে, তবে ততটা পিছনে থাকবে না, বিশেষ করে সামনের দিকে পাকে ছড়াবার জন্য যতটা দরকার হয়। অর্থাৎ বলের পিছনের লাইন যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেই লাইনে খেলোয়াড়ের দাঁড়ানো পা-এর আঙুলগুলো যেন থাকে। এবং বল-মারা পায়ের হাঁটু থাকবে বলের ওপর ও পায়ের পাতা, মাটি-অভিমুখীন।

১২ নম্বর ছবিতে দেখানো হচ্ছে বলের কোন অংশে কিক্ করলে Anti clockwise sfin করানো যায়। বলের ঠিক মাঝখান দিয়ে গোল করে যদি একটা লাইন টানা যায় তখন তাকে বলা হয়—Horizontal Midline। উপরোক্ত কিক্ করতে গেলে, খেলোড়কে মারতে হবে ঐ Horizontal Midline-এর একেবারে বাইরের দিকে। এবং হাঁটু থাকবে বলের ওপর। এতে বল কিছুটা নীচুতে থাকবে। আর যদি খেলোয়াড়, বল কিছুটা উঁচুতে তুলতে চায়—তখন তাকে মারতে হবে—ঐ লাইনের কিছুটা নীচুতে।

বিচারের বাণী

‘ফোর্থ রেফারী’

বিজ্ঞানী নিউটনের কথায়, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকতে বাধ্য ; অবশ্য বাস্তবে অনেক প্রতিক্রিয়ার বাহ্য ফল অনুভূত হয় না। মাটিতে পদাঘাত করলে মাটি কতটা উল্টে আঘাত হানে জানা না থাকলেও এটা বেশ বোঝা যায় নীরবে মেনে নিলেও সময় পেলেই সেও আমাদের পিছ্‌লে ফেলার চেষ্টা করে। গত ৫ই ডিসেম্বর বিশেষ গভর্নিং বডি মিটিং এ ৩নং, ৩০নং, ৩৫নং এবং ৩৬নং আইনের আমূল সংশোধন করিয়ে আই. এফ. এ যে ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার প্রতিক্রিয়ার ঢেউও ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। কালবৈশাখীর কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা না গেলেও একটা থমথমে ভাব ময়দানের এক চিলতে জমিতে গড়ে ওঠা তাঁবুর আশেপাশে উঁকি মারছে। “১৯৩২এ স্থাপিত, আমি সি. আর. এ.” ফলকটি আম্রকুঞ্জের আড়ালে আশঙ্কা মাখানো হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে যে কোন আগন্তুককে। কনে বউ এর মত সুখ-ভয় মিশ্রিত অনাগত দিনগুলির ভাবনায় সেও বোধহয় আজ আশা নিরাশার দোলায় দুলছে! পঞ্চাশ বছরের স্বপ্নময় মূর্তি উৎসবের প্রাক্‌ মুহূর্তে চিন্তা—নহবত খানায় সানাইএর মজলিস বসবে না বেহাগের সুর মূর্ছনা গুমরে গুমরে উঠবে,—কে জানে ?

রেফারী সংক্রান্ত আইনগুলির নবরূপায়ণ কল্পে আই. এফ, এর বৈপ্লবিক পদক্ষেপে হতচকিত বহুদিনের সহায়ক সংস্থা, ক্যালকাটা রেফারীজ অ্যাসোসিয়েসন্‌ (সি. আর. এ.) আজ অস্তিত্বের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ রূপ নেবার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ। পরমা সুন্দরী রাজরাণী হেলেনকে ভিন্‌দেশী রাজকুমার ফিলিপ চুরি করলে, চির বিবদমান গ্রীসের রাজারা প্রত্যেকে ঘটনাটি নিজের অপমান মনে করে, ঝগড়া ভুলে, হেলেন উদ্ধারে যেমন একতাবদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক তেমনভাবে সি. আর. এ. রূপী ট্রয় নগরীর তাঁবুতে বিপরীতমুখী শিবিরের ক্যাডাররা শেষ প্রতিরোধের প্রাচীর গড়তে একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। গত ১৬/১/৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে, বর্তমান সভাবৃন্দ, জেলার রেফারী বন্ধুরা এবং সমগ্র ক্রীড়া-সমাজকে আই. এফ. এ. পরিচালিত আগামী ফুটবল মরশুমে কোন খেলায় রেফারী হয়ে যোগ না দিতে অনুরোধ জানান হয়েছে। অতীতের প্রখ্যাত ফুটবলার উমাপতি কুমারের সভাপতিত্বে, রেফারী সংস্থার পূর্ব ক্ষমতাগুলি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত, ‘বাঁচার সংগ্রাম’ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২ই ফেব্রুঃ আই. এফ. এ. গভর্নিং বডির সভায় বর্তমান রেফারী-সভাপতি শ্রীসুনীল ঘোষ বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তিরূপে রেফারী সংস্থার বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। সভাশেষে সুনীলবাবু ও আই. এফ এ. সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি নিয়ে আরো আলোচনা করেন। কথামত ১৯।২ তারিখে ঐ মিটিং সংক্রান্ত একটি চিঠি বর্তমান সি. আর. এ. সম্পাদক শ্রীরমাকান্ত গাঙ্গুলী পেলেন। চিঠিতে জানান হোল সি. আর. এর স্বীকৃত (পাশকরা) রেফারীরাও লীগ ও শীল্ড খেলাগুলি পরিচালনা করতে পারবেন। আগের প্রস্তাবে কেবলমাত্র আই. এফ. এর খাতায় নতুন করে নাম না লিখালে সেটা সম্ভব ছিল না। আই. এফ. এর মতে এই নবতম ব্যবস্থায়, সি. আর. এর রেফারী এবং সংস্থাটি, উভয়েরই পূর্বকৌলিন্য বজায় থাকত।

সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে গত ২৫ ফেব্রুঃ রেফারী সংস্থার আর একটি বিশেষ সাধারণ সভা এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। অতি নিপুণভাবে সংস্থাটির বর্তমান কাউন্সিলের বক্তব্য তুলে ধরেন বর্তমান সহঃ সম্পাদক শ্রীসন্তোষ সেন। ফুটবল সংঘের মূল সংবিধান ও বর্তমান সংশোধনগুলি তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করে শ্রীসেন দেখান যে আই. এফ. এর পরিবর্তিত সংবিধানে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সহযোগী সংস্থারূপে থাকা রেফারী সংঘের আর কোন নামগন্ধ থাকবে না ; একমাত্র বাৎসরিক অ্যাফিলিয়েসন্‌ ফী এর নামে ১০০ টাকা চাঁদার কথা ছাড়া। সন্তোষবাবুর আরো ধারণা, এবছর অনেক আগেই ঐ চাঁদা মিটিয়ে দেওয়ায় আই. এফ. এ. চাঁদার ঘরে নামটা রাখতে বাধ্য হয়েছিল। আগামী বছর হয়তো ঐ চাঁদাও নেওয়া হবে না, আর নামমাত্র সম্পর্কটিও চিরতরে ছিন্ন হবে। বিভিন্ন দলউপদলের সমবায়ে সদ্যগাড়া কোয়ালিসন-কার্যকরী সমিতির (কাউন্সিল) তরফে আবার সকলকে আই. এফ. এর. ফাঁদে পা ফেলার বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে ও নিজেদের অস্তিত্ব এবং সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে তিনি সক্রিয় সদস্যদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে অনুরোধ জানান। স্পষ্ট বক্তা রেফারী, মিলন দত্ত, একটি পাল্টা প্রস্তাবে, অবসর প্রাপ্ত রেফারীদের কাছে অনুরোধ রাখেন, তাঁরা যেন আই. এফ. এর রেফারীজ বোর্ড বা অন্যকোনও সাব কমিটিতে যোগদান না করেন। সম্মেলনে এ প্রস্তাব সাথে সাথে গৃহীত হয়। নতুন চিঠিতে পূর্বতন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার বড় কোন আশ্বাসবাণী না থাকায় সভ্যদের আলোচনা ভিন্নমুখী হবার মুখে বর্তমান সহঃ সভাপতি এবং গভর্নিং বডির সদস্য রাসবিহারী চক্রবর্তী অশোকবাবুর একটি প্রস্তাব সভায় পেশ করেন। সংবাদে প্রকাশ, ঐদিন সকালে রাসুবাবুর সাথে অশোকবাবুর এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। শ্রী-ঘোষ সকলকে সভায় জানাতে অনুরোধ করেন যে, পূর্বআলোচনামত একবছরের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আবেদন আই. এফ. এ মানবে। অতএব, আবার মিলেমিশে কাজ করার পারিপার্শ্বিকতা তৈরী হোক, ফুটবলের স্বার্থে। রাসবিহারীবাবু মারফত অশোকবাবুর প্রস্তাবটি মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করে, নতুনভাবে ফলপ্রসু আলাপআলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলি সমাধান করার প্রস্তাব আনেন সর্বশ্রী নৃসিংহ চ্যাটার্জি, রমাকান্ত গাঙ্গুলী ও প্রদীপ নাগ। এর আগে, প্রাক্তন সভাপতি শ্রীউমাপতি কুমার বলেন—“চিরদিন আই. এফ. এর পতাকাতলেই সি. আর. এর পতাকা উড়েছে। ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার কর্তৃত্ব অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, বহুকালের প্রীতির বন্ধনে যাতে কোন চিড় না ধরে সে কথা মনে রেখে, কোন রকম জেহাদ ঘোষণা না করে, আমাদের উচিত প্রয়োজনীয় ও যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শগুলিতে আই. এফ. এর সম্মতি আদায় করতে ব্রতী হওয়া।” কিন্তু অশোকবাবুর লিখিত আশ্বাস তখনো পর্যন্ত না পৌঁছানোয় সম্মেলনে বিষয়টির ওপর যবনিকাপাত হয়। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, সি আর একে পূর্বের সবরকম ক্ষমতা ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কোন সভ্য আই এফ একে কোনভাবে কিছুতেই সহযোগিতা করবেন না।

শ্রী অশোক ঘোষ তাঁর ঐ চিঠি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন,—সি. আর. এ. প্রতিনিধির সাথে শেষ যে ‘ভদ্রলোকের চুক্তি’ হয় সেটা খেলাপ করা খুবই দুঃখজনক পরিণতি। প্র্যাক্‌টিক্যাল কতকগুলি অসুবিধার কথা চিন্তা করেই রেফারীরা আগের মতই সুসম্মানে যাতে খেলাতে পারেন, সেইজন্য নতুন সংশোধনে সি. আর.-এর রেফারীদের নিয়ে এ বছরের খেলাগুলো চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছে, রেফারীজ বোর্ডের ৫ জন সদস্যই হবেন ক্লাব প্রতিনিধি বর্জিত প্রাক্তন নামী ও ও গুণী রেফারী, যাঁরা পুরোপুরি টেক্‌নিক্যাল লোক এবং সাধারনতঃ যে কোন নোংরামি থেকে দূরে থাকতে ভালবাসেন। এছাড়া, পরীক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে সি. আর. এ আগে যেমন চলছিল তেমনভাবেই পূর্ণ স্বাধিকার নিয়ে একবছর কাজ করবে। এ’বছর রেফারী সংস্থা মিলেমিশে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করলে এক বছরের বন্দোবস্ত বহু বছরের জন্য স্থায়ী হতে পারতো নিশ্চয়ই। আগামী সাধারণ সভায় (এপ্রিল মে-তে কলকাতার ফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হবার পর) সব সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গৃহীত হবার জন্য উত্থাপন করার আগে গভর্নিং বডি ভেবেছিল কাজটা এগিয়ে নেবেন। সময়াভাবে ফুটবল সীজনের মুখে নতুন কিছু করা সম্ভব নয়। অশোকবাবুর খেদ রেফারীরা শেষ চিঠির মাধ্যমে আই. এফ. এর কাছে যে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে একটা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর বাতিল কেন ?

সমুদ্র চৌধুরী

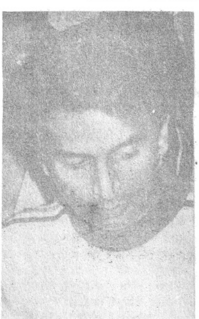
ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ ভেস্তে গেল। এর আগেও বহু প্রস্তাবিত ভ্রমণ বাতিল হয়েছে কিন্তু কোনটাই এরকম প্রচণ্ড একটা সমস্যা নিয়ে হাজির হয় নি। যে সমস্যা বা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব গত বছর ইংলণ্ড ভ্রমণের সময়ে শুরু হয়েছিল সেটাই অন্য একটা রূপ নিয়ে আত্মবিকাশ করল৮ আর একটু খোলসা করে বলতে হয়, গত বছর ক্রি কণ্ট্রোল বোর্ডের দৃঢ়তার কাছে যে ক্রিকেট প্লেয়ার্স এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দকে বাধ্য ছেলের মত বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল, আশি সালের প্রথম দিকে দেখা গেল তাদের উন্নত শির বিরাট হয়ে পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে। আর একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে গাভাসকার যেন চিন্নাস্বামীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছেন, এবং কিছুটা প্রমাণও করেছেন। ভারতের ক্রিকেটাররা তার অঙ্গুলি হেলনে ওঠে বসে, বোর্ডের কথায় নয়। অনেকবার এই ঐক্য ভাঙবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু দেখা গেছে সফল হয়নি। কিন্তু একটা কথা, এই রাজনীতির আবর্ত গাভাসকারের ক্রীড়াজীবনে অন্ধকার টেনে আনবে না ত? ব্যাপারটা একটু পর্যালোচনা করা যাক।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৭৮এ পাকিস্তান ট্যুরে। যদিও পাকিস্তানের কাছে ভারত ২—০ ম্যাচে পরাজিত হ'ল, একটা গুজব রটল ভারতের সাত আট জন প্রথম সারির খেলোয়াড় প্যাকারের জালে আবদ্ধ। এই রটনার মধ্যে ঘটনা কিছুই ছিল না, তবে কিছু উদ্দেশ্য ছিল, সেটা আর কিছুই নয় বোর্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করা প্রিমিয়াম বাড়ানর জন্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সফরের সবচেয়ে সফল ব্যাটস্‌ম্যান সুনীল গাভাসকার বিষেণ সিং বেদীর স্থলাভিষিক্ত হলেন ভারতের অধিনায়করূপে। নিজের ব্যাটিং উৎকর্ষ ছাড়াও সুচতুর পরিচালন নৈপুণ্যে গাভাসকার ভারতকে পরাজয়ের গাঢ় অন্ধকার থেকে জয়ের উজ্জ্বল আলোকে এনে ফেললেন। নিজভূমিতে এই প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার জয়। গাভাসকার এখন ভারতের ক্রিকেট জগতে অবিসম্বাদিত নেতা। কিন্তু আবার রাজনীতির খেল্ শুরু হল, কে বড়—বোর্ড ন প্লেয়ার এ্যাসোসিয়েশন।

ভারতের পরবর্তী সূচী দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং ইংলণ্ড সফর। আবার প্যাকারের হাওয়া উঠল এবং সানি গাভাসকার কোথাও কোথাও প্রকাশ করে ফেললেন, অধিনায়কত্বের ভার বহন করতে গিয়ে তিনি নিজের খেলা খেলতে পারছেন না। ইতিমধ্যে ক্রিকেট প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশনও গঠিত হয়েছে। বোর্ড কিছুটা নিজের শক্তি যাচাই করার জন্য, আর কিছুটা এই সব কষ্টিনষ্টির মুখে কুলুপ আঁটার জন্য একটি বণ্ড বের করে দিলেন ইংলণ্ড গমনেচ্ছু ক্রিকেটারদের সামনে।

খেলোয়াড় সংস্থা থেকে আপত্তির ঝড় উঠল এর বিরুদ্ধে। কিন্তু বোর্ড সিদ্ধান্তে অবিচল ফলে খেলোয়াড় সংস্থার প্রতিবাদের বরফ গলতে শুরু করল। একে একে সবাই বণ্ডে সই করল। বোর্ড সুযোগ বুঝে দুটি ছোবল মারলো। প্রথম ছোবলে সৈয়দ কিরমানি দল থেকে বাদ, পাকিস্তান সফরে ব্যর্থতার অজুহাতে। দ্বিতীয় আঘাতে দলপতি হলেন তামিল নাড়ুর ভেঙ্কটরাঘবন। উইকেট কিপার হিসেবে এলেন ভরত রেড্ডী ও সুরিন্দার খান্না। দক্ষিণ ও উত্তরে ভাগাভাগি। দলে এলেন পাকিস্তান সফরে চরম অকৃতকার্য্য বিষেণ সিং বেদী ও চন্দ্রশেখর। সঙ্গে রইলেন মহিন্দর অমরনাথ, ব্রিজেশ প্যাটেল, কিন্তু বাদ পড়লেন কিরমানি। কিরমানির নামটা বারবারই আসছে কারণ ও নাকি তার অফিস থেকে ছুটি চেয়েছিল, অনেকে মনে করেছিল সম্ভবতঃ প্যাকারের যোগদানের উদ্দেশ্যে। আর তাছাড়া এটা সবার জানা, গাভাসকার, বিশ্বনাথ, বেঙ্গসরকার, কিরমানি, যশপাল শর্মা, কপিলদেব, ঘাউড়ি, চেতন চৌহান-এরা সবাই কাছের মানুষ। কিরমানিকে বাদ দেওয়া মানে এই গ্রুপটার ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত হানা বিশ্বকাপের খবর সর্বজন বিদিত। শ্রীলঙ্কার কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর অনেকেই বলেছিলেন ইংলণ্ড সফর বাতিল করে ভারতের ফিরে আসা উচিত। ১০৬৭ বা ১৯৭৪ সালের ভারতকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা সবাই ভুলে গিয়েছিলাম, গাভাসকার নামক এক ক্রিকেট বিস্ময় সেখানে রয়েছে। প্রথম টেস্টে ইনিংসে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট মূলতঃ বৃষ্টির জন্য অমীমাংসিত। পরে শেষ টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে চারশর ওপর রান তুলে জয়ের মুখে এসে পড়ল ভারত। ভারতের আট উইকেটে ৪২৯ রানের মধ্যে গাভাসকারের অদ্বিতীয় ২২১। ফলে লেন হাটনও বলে ফেললেন, দি গ্রেটেষ্ট ইনিংস– যে পরিস্থিতিতে গাভাসকার ২২১ করেছেন তা ব্র্যাড ম্যানের অতি বড় ইনিংসকেও ম্লান করে দেয়। সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে যখন প্লেনটা এসে থামল বড় বড় অফিসিয়ালরা কি ভাবে গাভাসকারকে সম্বর্দ্ধনা (না আনুগত্য) জানাবেন ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলেন না। এবং তখনই ভারতের একমাত্র ক্রিকেট চরিত্র অবিসম্বাদিত নেতা হয়ে উঠলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দল গঠনের ব্যাপারে একটা সিলেকশান কমিটি থাকল বটে, তবে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল গাভাসকারের মতামতই সব। সানি নিশ্চয় মনে মনে হিসেব করে নিয়েছিলেন, এবার আর বোর্ডের চাল ভুল দিলে চলবে না, খুব ভেবে চিন্তে এগুতে হবে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতীয় দলকে সম্পূর্ণ করতলগত করে ফেললেন।—অমরনাথ ব্রাদার্স আউট, ভেঙ্কটরাঘবনের জায়গায় এল শিবলাল যাদব আর নরসিমা রাওকে কলকাতা টেস্টে এক্সপোজ করে দিয়ে দেখালেন ও অচল। ফলে


কপিলদেব


গাভাসকার

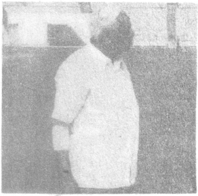
পাকিস্তান সিরিজ সুরু হওয়ার আগে এমন একটি দল গঠিত হ'ল যার পুরোন খেলোয়াড়রা হ'ল তাঁর আপনজন, আর নতুনরা তার ব্যক্তিত্বের সামনে চুণোপুঁটি।

দু'একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন যেটা প্রমাণ করবে গাভাসকার কি এখন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সামনে —

কলকাতায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলার সি. এ. বি আয়োজিত এক সম্বর্দ্ধনা সভায় পুরস্কার বিতরণের পর ছোট একটা ইশারা দেখলাম গাভাসকারের চোখে, আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত খেলোয়াড়রা উধাও। পাকিস্তান সিরিজে নরসিমা রাওএর জায়গায় এল রজার বিনি এবং মদনলাল মহিন্দারের রাস্তা আটকে রাখল সন্দীপ পাতিল। পাতিলের ভারী ব্যাটে শক্ত হাতের খেলায় দু'জনের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল চেতন চৌহান আর শিবলাল যাদব। যাদবকে ছাড়া গেলেও যেতে পারে কিন্তু চৌহানকে নৈব নৈব চ। তারই প্রতিফলন দেখা গেল মাদ্রাজ টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে। প্রথম ইনিংসে ১৬১ রানের পর দ্বিতীয়তে চৌহান যখন ৩৯, গাভাসকার তখন দুই। গাভাসকারের মত ব্যাটসম্যানের পক্ষে রাণ না করে সতীর্থকে সাহায্য করা যে কি কঠিন ব্যাপার সেটা সহজেই অনুমেয়।

এর পরে বন্ধুপ্রীতি দেখা গেল একক উইকেট প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান মাঠে। যখনই গাভাসকার ও কপিলদেব ফাইনালে উঠল এটা কি রকম ভাবে যেন জানাজানি হয়ে গেল ওরা জয়েন্ট চ্যাম্পিয়ন হবে—সেদিনই মাঠে ঘোষনাটা হ'ল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু আসল বোমাটা গাভাসকার ফাটিয়েছিলেন অনেক আগে, মাদ্রাজ টেস্ট শেষ হতেই। গাভাসকারের সঙ্গে ক্রিকেট করেসপণ্ডেন্টদের খুব একটা ভাল সম্পর্ক ছিল না। সাক্ষাৎকারের খুব আপত্তি ছিল ভারতীয় অধিনায়কের। সেই গাভাসকারই মাদ্রাজ টেস্ট শেষ হওয়া মাত্রই ডেকে পাঠালেন সাংবাদিকদের এবং ঘোষণা করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাবেন না আর ভারতীয় দলের অধিনায়ক পদ ছেড়ে দিচ্ছেন। এর পরই সুরু হ'ল নানা জল্পনা-কল্পনা। কেউ বললেন বন্ধু অমল পালেকরের আহ্বানে রূপোলী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবেন, কেউ মন্তব্য রাখলেন 'সানি ডেজ' বইতে জ্যামাইকার দর্শকদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের দরুণ ওখানে তার অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে, সেইজন্যই ওখানে যেতে চাইছে না।

মাদ্রাজ টেস্ট জয়ের পরই তার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথম, তিনি জানতেন ছ'মাসের মধ্যে সতেরটি টেস্ট খেলে তার এবং অন্যকারও সামর্থ নেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রবার্টস, হোল্ডিং, গার্ণার, ক্রফ্‌ট প্রমুখ ফাস্ট বোলারের গোলার সম্মুখে দাড়ান। প্রতিটি সিনিয়র খেলোয়াড়ই শারীরিক ও



চিন্নাস্বামী / প্রীতিময় চক্রবর্তী

মানসিক দিক থেকে অক্ষম। সেজন্য এ সফরে কখনই যাওয়া উচিত নয়। উপরন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দর্শকের সামনে যে ভাবমূর্তি আছে সেটা গাভাসকার নষ্ট করতে চাইলেন না।

দ্বিতীয়তঃ খেলোয়াড় সংস্থার সঙ্গে আলোচনা না করে কেন সফর স্থির হ'ল খেলবে কারা, বোর্ডের লোকেরা না ক্রিকেটাররা কাজেই তাদের মতামতের কোন দরকার নেই? ওখানেই গুজব ছাড়িয়ে ছিল কিরমানি বেঙ্গসরকার, কপিলদেব যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড বণ্ড বের করলেন। গাভাসকারের সামনে এখন ট্রাম্প কার্ড কপিল দেব। কাজেই তাকে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে, এবং করলেনও তাই। মাঝে গাভাসকার একবার দিল্লীতেও দরবার করলেন ট্যুর ক্যানসেল করার জন্য। অনুচর মারফৎ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ডেও অনুরূপ আবেদন গেল। সাগরপার থেকে প্রশ্ন তোলা হ'ল গাভাসকার না এলে টিকিট বিক্রী করব কি করে?

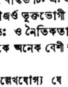
কলকাতার হাওয়ায় একটা কথা ভাসান হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ড ওখানকার ভারতীয় হাই কমিশন মারফৎ নাকি খবর পাঠিয়েছে, গাভাসকার গেলে ওখানে 'ল' এ্যাণ্ড অর্ডার' প্রবলেম হবে, ওর না আসাই ভাল। – এদিকে চিন্নাস্বামী বলে ফেললেন গাভাসকার ইজ নট ইনডিসপেন্সেবল্, গাভাসকার অপরিহার্য নয়। সংঘাত যখন তুঙ্গে সেই ডামাডোলে একটা খবর এল, কপিলদেব বণ্ডে সই করেনি। এর পরের গল্প সবারই জানা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ড কিছুটা ভারতীয় বোর্ডের মান বাচানর জন্যেই জানালেন তাদের খেলোয়াড়রা ক্লান্ত। কিন্তু আসল তথ্য ফাঁস করলেন ভারতীয় বোর্ডের অতিথি হেয়ফ ইলমেয়ার বোম্বাইএ জুবিলী টেস্ট দেখতে এসে, গাভাসকার – কাপিলবিহীন ভারতীয় দলকে আনতে ওখানকার সফরের উদ্যোক্তা বেনসন্ এ্যাণ্ড হেজেস্ কোং চাইছে না এতএব সফর ভণ্ডুল।

এ সবইত হ'ল, এখন যে কথাটা বার বার খোঁচা দিচ্ছে, সেটা হ'ল এই রাজনীতিতে জড়িয়ে থেকে গাভাসকার নিজের খেলা রাখতে পারবেন ত? না, বাকি ছটা সেঞ্চুরি আমরা আর দেখতে পাবনা।

২৩ পাতায়র শেষাংশ

কনফ্রনটেশন বা সংগ্রামী মনোভাব আসন্ন হয়ে উঠতে পারে; সেটা তাঁরা মোটেই চান না। বর্তমানে আই. এফ. এর নথিভুক্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের (এক ডজনের ওপর) রেফারী আছেন। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছে যাঁদের একমাত্র পরিচয় আই. এফ. এর রেফারী হিসাবে। এছাড়া স্টেট্ ক্লাস ওয়ান প্রায় জনা কুড়ি রেফারী আসন্ন সর্ব ভারতীয় পর্যায়ের রেফারীশীপ্ পরীক্ষায় বসার অপেক্ষায় আছেন। রাজ্য বা সর্ব ভারতীয় স্তরে রেফারিং করতে হলে, আই. এফ. এর (নিয়ামক সংস্থা) আনুগত্য মেনে, প্রস্তাবিত 'এল' ফর্মে উপরোক্তদের নাম পাঠাতে বললে,—সেটা কি বে-আইনী বা অশোভন কিছু হবে? অন্যান্য রাজ্য সংস্থায় তো এই জাতীয় রেফারীরা সকলেই রাজ্য সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাঁশী বাজান বলে আই. এফ. এর খবর। এখানে সেটা এতকাল আই. এফ. এ, সি. আর. এর মাধ্যমে করতো। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে সরাসরি করতে হতে পারে বলে আই. এফ. এ কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা। এ প্রসঙ্গে অশোকবাবুর ধারণা, পুরাতন ব্যবস্থায় সব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন সক্রিয় রেফারীরা। ধরা যাক, গত ৫ বছর ধরে সন্তোষট্রফি বিজয়ীরা যে সব পুরস্কার বা সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তা অনুরূপভাবে রেফারীদের দিতে বললেই মিটিং এ কেউ কেউ নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং পরিণতিতে রেফারীরা ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। যেমন বর্দ্ধিত টি. এ. এবং টিফিনের ব্যাপারে ওঁরা আজও ভুক্তভোগী। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় আইনতঃ ও নৈতিকতায় রেফারীরা আই. এফ. এ থেকে অনেক বেশী সুযোগ পেতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনার গতি-প্রকৃতি কোন্ খাতে বইবে সেটা অনেকটা নির্ভর করছে ভ্রাতৃসংঘ ও অরোরা ক্লাবের আনীত কেসগুলির ফলাফলের ওপর। কোর্টের রায় যাই হোক না কেন এবং দুই পিতা-পুত্রবৎ সংস্থা দুটির মুখোমুখি সংঘাতের ফলে যাই ঘটুক না কেন, কিছুকিছু ক্রীড়ামোদী মনে করেন বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য যুগে যুগে ওদেশে দেশে স্বীকার করা হয়ে আসছে। শাসন বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বিচার বিভাগের অবগাহন, আর যাই হোক বিচারের বাণীকে কতটা পরিশুদ্ধ রাখতে পারবে, সেটা আর একবার চিন্তা করে দেখলে ভাল হয়।



প্রশ্ন আমাদের উত্তর আপনাদের

আমরা পাঁচটা প্রশ্ন আপনাদের সামনে রাখছি। নির্ভুল উত্তরদাতাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। উত্তর এপ্রিলের পাঁচ তারিখের মধ্যে আসা চাই। শুধু প্রশ্ন নাম্বার লিখে উত্তর দিলেই চলবে। পোস্ট কার্ডের উপর পরিষ্কার করে লিখুন: 'প্রশ্ন আমাদের উত্তর আপনাদের'।

প্রশ্ন: (১) অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান শিপে ১৯৬০ সালে পুরুষবিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছিলেন? তিনি কোন দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?

(২) কলকাতা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে ১৯৬০ সালে কোন দল? কত গুলি গোল দিয়ে ক পয়েণ্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল?

(৩) ১৯৭০ সালে বিশ্ব মোটর রেসিং প্রতিযোগিতায় কোন কোম্পানীর গাড়ী প্রথম স্থান অধিকার করেছিল?

(৪) বিশ্বনাথ জীবনের প্রথম শতরানটি করার পথে কটি চার মেরেছিলেন?

(৫) বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে কে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শতরান করেছেন?

পৃথিবীব্যাপী চতুর্দিকে খেলা আর খেলা। অসংখ্য রেকর্ড তৈরী হচ্ছে পুরনো রেকর্ড ভেঙ্গে। আপনার অজানা অনেক প্রশ্ন আপনার কাছে জমা আছে। যদি জানতে চান আমাদের এই বিভাগে প্রশ্ন পাঠান। পোস্টকার্ডের উপরে পরিষ্কার করে লিখুন: 'প্রশ্ন আপনাদের উত্তর আমাদের'।

পৃথক পৃথক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক পোস্টকার্ড ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন আপনাদের, উত্তর আমাদের



বলুন তো কে?

১৬ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ছবি ছিল খুবই সহজ। সঠিক উত্তর দাতাদের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশী। ভুল করেছেন মাত্র পাঁচজন। তার মধ্যে তিনজন লিখেছেন গাভাসকার আর বাকি দুজন কিরমানি আর মজিদ খান। এত সহজ ছবি ছিল যে আমাদের দপ্তরে নির্ভুল চিঠির পাহাড় জমে গেছিল।

ভাগ্যবান

উত্তরদাতা: শুভ্র ভট্টাচার্য -কসবা, কলকাতা—৪২

এবারের জবাব আসা চাই ১ এপ্রিলের মধ্যে। উত্তর প্রকাশিত হবে ১৬ এপ্রিল সংখ্যায়। এ ছবিও খুব পরিচিত আপনাদের কাছে। নির্ভুল উত্তরদাতাদের মধ্যে একজনকেই লটারী করে পুরস্কার দেওয়া হবে মাত্র পঁচিশ টাকা।

ময়দানের ডায়েরী

ঐ তো ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা

আই. এফ. এ সব ক্লাবগুলোকে নিয়ে এক সভা ডেকেছিল। এই সভায় সব ক্লাব থেকেই একজন করে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা শুরু হবে হবে করেও হতে পারছে না—তখনো ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে কেউ না আসায়। এমন সময় সকলেই প্রস্তাব দিলেন ঠিক আছে সভা আরম্ভ করা যাক। কেউ



কেউ বলে উঠলেন না, না ইস্টবেঙ্গলের এখনো কেউ এসে পৌছয়নি আর একটু অপেক্ষা করা যাক। মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিনিধি শৈলেন মান্না সাথে সাথে আই. এফ. এ সহঃ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তকে দেখিয়ে বললেন কে বলল ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তা নেই, ঐ তো জ্যোতির্ময়বাবু আছেন? উনিই তো এখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দল তৈরী করছেন—এমন প্রমাণ আমার হাতে আছে। সভা এখনই শুরু করা যাক।

৫৭ জন দর্শক

ইস্টবেঙ্গল মাঠে সেদিন দু দলের হকি খেলা শুরুর সময় খেলোয়াড়, আম্পায়ার, মালী নিয়ে মোট সংখ্যা ছিল ৩২ জন। তারপর প্রায় কুড়ি মিনিট পর এলো ৪ জন। তারপর এক এক করে খেলার শেষ বাঁশি বাজবার আগে একবার গুনে ফেললাম মোট ৫৭ জন। মুড়ি বিক্রেতা—২, স্টলের—২, বাইরে থেকে কলকাতা মাঠ দেখতে এসেছেন—৫ জনের একটি দল, ধরে।

কলকাতা ফাঁকা—অফিস কামাই

এমনিতেই ভারতীয় দল বাইরে খেলতে যাওয়ায় বেশ কিছু স্টার ফুটবলার (যারা এবছরের বড় রকমের টার্গেট) কলকাতার বাইরে। তার ওপর প্রথম ডিভিশনে খেলেন দলবদলের টার্গেট এমন বহু খেলোয়াড় গত পনের দিন ধরে অফিস আসছেন না। এমনকি তারা কোথায় আছেন, সেটা পর্যন্ত বলতে পারার মত অফিসে কেউ নেই। সোজা কথায় বলা যেতে পারে কলকাতাতে এখন আঙুলে গুণতে পারা যায় এমন কয়েকজন (যারা দলবদল করবেন না) মাত্র খেলোয়াড় আছেন। বাকীরা সব বাইরে।

স্কুলের বেঞ্চে বেঞ্চে ধীরেন দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে গত ক'বছর ধরে কয়েক ডজন 'লিপি' লেজুড় জুড়ে দেওয়া খাতা বাজারে খুব চল হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—বঙ্গলিপি, বর্ণ লিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি। ইদানীং মালার ছড়াছড়ি। সেদিন বাসে হেয়ার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান নিয়ে। এক সাথে প্রায় দশজন মোহনবাগান সমর্থক কিনেছেন বর্ণমালা খাতা। পেছনে পেলের সাথে ধীরেন দে'র ছবি। সকলেরই এক কথা: আরে আমরা তো পেলেকে এনেছি,—তোরা কাকে আনলি?

—ঐ তো এনে এই অবস্থা "এখন স্কুলের বেঞ্চে বেঞ্চে সাধারণ সম্পাদক।"

—আচ্ছা তোরাও নিয়ে আয় না, আমরা



কলেজের বেঞ্চে জায়গা করে দেবো।

আর শোনা হয়নি বাস থেকে নেমে পড়ায়।

আপনি মারা গেছেন বিজ্ঞাপন দিন

সম্প্রতি দলবদলের জন্য বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে ধরে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থা যে দেখা যাচ্ছে খেলোয়াড় যাকে গুরু বলে মেনে নিয়ে এতদিন পরামর্শ করছিলেন। সেই গুরুকে পর্যন্ত না জানিয়ে উধাও হতে হচ্ছে। এমন একজন গুরু সেদিন একজনকে দুঃখ করে বলছিলেন—"আমায়ও জানিয়ে যায়নি, কোথায় থাকবে, একবার দেখা হলে ভাল হত।"

পরামর্শদাতার উত্তর: কাগজে বিজ্ঞাপন দিন আপনি মারা গেছেন, একবার যেন দেখা করে। তাহলে হয়ত কাজ হবে।

কি রকম দেখতে?

সেদিন ইস্টবেঙ্গল টেন্টে সকালে বেশ কিছু সমর্থক এসেছিলেন দল কেমন হচ্ছে জানতে। পেয়ে গেলেন এক খেলোয়াড়কে জিজ্ঞেস করলেন দলের কি হবে? খেলোয়াড়টি ভালভাবে উত্তর দিয়েছিলেন আমি কি জানি? কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করুন। সেই দলটি জবাব দিয়েছিল 'কোথায়' কাউকে তো দেখছি না। আচ্ছা নিশীথ ঘোষকে কেমন দেখতে বলতে পারেন?' খেলোয়াড়টি জবাব দিয়েছিলেন 'আমরাই দেখিনি আর আপনারা।'

খেলা চালাচ্ছেন খেলোয়াড়েরা

এই মাসের বারো তারিখে মোহনবাগান মাঠে হকি খেলা ছিল ই. আর. এফ. সি. বনাম বি. এন. রেলের। আম্পায়ারের দেওয়া রায় মেনে নিতে পারেননি বি. এন. আর. দলের খেলোয়াড়েরা। রেলের খেলোয়াড় রহমান স্টিক দিয়ে খোঁচা মারেন আম্পায়ার সমর মুখার্জীর চোখে। তখন আম্পায়ার রহমানকে লাল কার্ড দেখিয়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। অন্য এক খেলোয়াড় জামাল অপর প্রান্তের আম্পায়ার তারক সেনকে একই ধরণের ব্যবহার করলে জামালকেও মার্চিং অর্ডার দেওয়া হয়। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় দুজন খেলোয়াড়ই আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্য করে মাঠের মধ্যে বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে থাকেন। শেষমেষ আম্পায়াররা খেলা বন্ধ করে চলে যান। দেখা যাচ্ছে আম্পায়াররা মাঠে ছবি মাত্র, খেলোয়াড়দের মতামতই চূড়ান্ত—তবে আর মাঠে আম্পায়ার কি প্রয়োজন আছে, খেলা পরিচালনা করার জন্য।



সুভাষ ভৌমিক পাকড়াও করেছিলেন

গত সংখ্যায় 'খেলার কথা' তে যেহেতু আমরা লিখেছিলাম সুভাষ ভৌমিককে বুঝি আর আমরা জার্সি গায়ে দেখতে পাব না; সেই হেতু ভৌমিক এখন চিন্তা করছেন ময়দানের ডায়েরীর লেখক মিথ্যে লেখেন এটা কিভাবে প্রমাণ করা যায়। অর্থাৎ ভৌমিক আবার নতুন চিন্তা করছেন। আমরা জানি ভৌমিক চেষ্টা করলেই সব করতে পারেন, এতটা মনের জোর তার আছে। তবে ভৌমিক আমাদের পাকড়াও করলেও ঝগড়া করেননি কারণ তিনি খেলোয়াড়-সাংবাদিক হতে চলেছেন। সাংবাদিক কি সাংবাদিকের সাথে ঝগড়া করেন?

ইয়ান বোথামের দ্রুততম 'ডাবল'

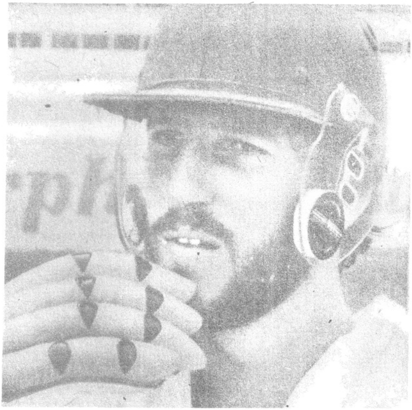
এর আগে এই রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় জে. এম. গ্রেগরি ১৯২০—২১ এ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্ণের মাঠে ১০০ রান করেছিলেন এবং ৬৯ রানে ৭ ও ৩২ রানে ১ উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন।

বোথাম নিজের রেকর্ড ভাঙলেন বোম্বাইতে ভারতের বিরুদ্ধে জুবিলী টেস্ট খেলতে এসে এবং নতুন বিশ্ব রেকর্ড করলেন। ১১৪ রান করলেন ১৪৪ বল খেলে ২০৬ মিনিটে—উইকেট সংগ্রহ করলেন মোট ১৩টি।

বোথাম প্রথম খেলোয়াড় যিনি একই টেস্টে শতরান ও পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করেছেন তিনবার। এছাড়া গ্যারি সোবার্স ৪২ ও ৫৬ তম টেস্টে এবং মুস্তাক মহম্মদ ৩০ ও ৪৮ তম

বোথামের প্রথম টেস্ট ১৯৭৭এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ট্রেন ব্রিজে, জুলাই মাসে। মাত্র এগার মাস পর সপ্তম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছেন—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭৮এ লর্ডস মাঠে, দ্বিতীয় টেস্টে। একই টেস্টে শতরান (১০৮) ও আট উইকেটের রেকর্ড। ১৬ই জুন ১০০ রান (১১×৪+১×৬) করেছেন ১০৪ বল খেলে মাত্র ১২৭ মিনিটে। ১৯ জুন মাত্র ৩৪ রান দিয়ে পেয়েছেন ৮ উইকেট।

টেস্টে এরকম রেকর্ডের অধিকারী কিন্তু দুবার করে।



বোথাম ১৯৭৯তে আগস্টের ৬তে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে গাভাসকারের উইকেট নিয়ে সংগ্রহ করেছেন ১০০ উইকেট। চব্বিশ দিন পর ৩০ আগস্ট ওভালে, ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম দিনে নিজের রান (মোট) সংগ্রহ করলেন ১০০০। সেদিন বোথাম দ্রুততম বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হলেন।

এখানে বোথামের ঐ দিনের রেকর্ড আছে।

খেলোয়াড়	দেশ	কত নাম্বার টেস্টে ডাবল	মোট রান	মোট উইকেট	মোট টেস্ট
ইয়ান বোথাম	ইংল্যাণ্ড	২১	১০৩৫	১০৭	২১
ভিনু মানকাদ	ভারত	২৩	২১০৯	১৬২	৪৪
কপিলদেব	ভারত	২৫	১০৬৮	১০৩	২৬
মন্টি নোবল	অস্ট্রেলিয়া	২৭	১৯৯৭	১২১	৪২
জর্জ গিফেন	অস্ট্রেলিয়া	৩০	১২৩৮	১০৩	৩১
রিচি বেনো	অস্ট্রেলিয়া	৩২	২২০১	২৪৮	৬৩
কিথ মিলার	অস্ট্রেলিয়া	৩৩	২৯৫৮	১৭০	৫৫
মরিস টেট	ইংল্যাণ্ড	৩৩	১১৯৮	১৫৫	৩৯
এ্যালান ডেভিডসন	অস্ট্রেলিয়া	৩৪	১৩২৮	১৮৬	৪৪
ট্রেভর গডার্ড	দঃ আফ্রিকা	৩৬	২৫১৬	১২৩	৪১
টনি গ্রেগ	ইংল্যাণ্ড	৩৭	৩৫৯৯	১৪১	৫৮
রে. লিণ্ডওয়াল	অস্ট্রেলিয়া	৩৮	১৫০২	২২৮	৬১
ফ্রেড টিটমাস	ইংল্যাণ্ড	৪০	১৪৪৯	১৫৩	৫৩
ইনতিখাব আলম	পাকিস্তান	৪১	১৪৯৩	১২৫	৪৭
উইলফ্রেড রোডস	ইংল্যাণ্ড	৪৪	২৩২৫	১২৭	৫৮
ইয়ান জনসন	অস্ট্রেলিয়া	৪৫	১০০০	১০৯	৪৫
ট্রেভর বেইলি	ইংল্যাণ্ড	৪৭	২২৯০	১৩২	৬১
রে. ইলিংওয়ার্থ	ইংল্যাণ্ড	৪৭	১৮৩৬	১২২	৬১
গ্যারি সোবার্স	ওঃ ইণ্ডিজ	৪৮	৮০৩২	২৩৫	৯৩

পরিসংখ্যান : নীরব রায়

আই এফ. এ শীল্ড ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজবার পাঁচ মিনিট পরের নতুন দাবী ডুরাণ্ড চাই। ডুরাণ্ডের শেষ বাঁশি বাজবার দশ মিনিট পর রোভার্স চাই। রোভার্সের পর ফেডারেশান চাই। ফেডারেশানের পর লীগ চাই। সমস্ত কোচদের এই চাই-এর ব্যাপারটা শুনতে হবে। না শুনলেই ভূমিকম্প।



আই. এফ. এ শীল্ডে জেতবার পর এক সমর্থকের চাওয়ার উত্তরে।

প্রদীপ ব্যানার্জী

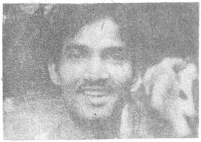
এক সময় স্বপ্ন দেখতাম : আমিও একদিন অর্জুন পুরস্কার পাব। যোগ্য হতে পারিনি বলেই পাইনি। তবে না পাওয়ার জন্য আর কোনো দুঃখ নেই—কেননা—এই পুরস্কার এখন গুরুদেব সিং-এ এসে ঠেকেছে।



অর্জুন পুরস্কার সম্বন্ধে মতামত দিতে গিয়ে।

সুভাষ ভৌমিক

আমি তো ভাবতে পারি না, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডান কোন খেলায় পয়েন্ট হারালে, গোল না দিতে পারলে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটবে কেন? কেন কমজোরী, কম নামী দল ভাল খেললে তাদের প্রশংসা না করে খেলোয়াড়দের ঢিল মারা হবে। আমরাও তো ছোট দল থেকেই বড় দলে এসেছি।



ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কয়েকজন ক্ষুরে আক্রান্ত হবার পর।

গৌতম সরকার।

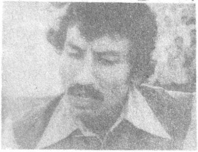
অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আমাকে ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল। আজ তোমরা আমার মান রেখেছে।



লীগে (১৯৭৯) মহঃস্পোর্টিং বনাম ইস্টবেঙ্গল খেলা অমিমাংসিতভাবে শেষ হবার পর, মোহনবাগান মাঠে।

অমল দত্ত।

ডুরাণ্ডে হেরে যাবার পর আমি ট্রফি নিতে ইচ্ছা করে যাইনি—একথাটা রটে গেল। কথাটা হাস্যকর। এর চেয়ে খারাপভাবে হেরেছি ১৯৭৫এর শীল্ডে, সেই পাঁচ গোল খাওয়ার দিনেও মোহনবাগান টীমে ছিলাম। আবার ত্রিমুকুট জয়ী টীমেও থেকেছি। হার-জিত দুটোই আসে খেলোয়াড়ের জীবনে। ফাইনালে হেরে গেলে ট্রফি নিতে যাব না—এমন ছেলেমানুষী বা অভদ্র অন্ততঃ আমি নই।



ডুরাণ্ডে (১৯৭৮) ট্রফি নিতে যেতে না পারায়—সমালোচনার উত্তরে।

প্রসূন ব্যানার্জী।

অনেকদিন ধরে ক্লাবে যাই না। এছাড়া আমি শারীরিক অসুস্থ দীর্ঘদিন ধরে। তবু ইস্টবেঙ্গল নামটা আমার রক্তে খেলা করে।



য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ৺বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে ভাষণ দান কালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

ডাঃ নৃপেন দাস।

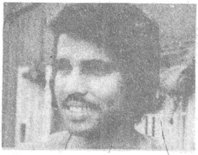
ঠিক সময়ে কর্মকর্তাদের সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করা সত্ত্বেও, কোনও প্রতিকার না করে ঘটনা চরমে উঠলে কর্মকর্তারা সমস্ত দোষ কোচের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। কর্মকর্তাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ই এই অশান্তির মূল কারণ। কড়া হাতে উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা দূরে থাক লোক চক্ষুর আড়ালে যে যার পেয়ারের খেলোয়াড়ের পিঠ চাপড়েছেন।



লীগে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা বনাম কোচের তর্কযুদ্ধে কোচের জবানী।

অরুণ ঘোষ।

আমি খেলতে পারলেই খুশী, তাই বলে এমন নয় যে আমি খেলতে না পারলেও দলকে ডোবাতে আমাকে মাঠে নামাতে হবে। আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি দলের স্বার্থে আমি সাইড লাইনে বসতে রাজি আছি।



লীগে (১৯৭০) মোহনবাগানের কোচ বনাম অধিনায়কের বিতর্কে অধিনায়ক।

দিলীপ পালিত।

ময়দানে তাঁবু তৈরীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জমির জন্য সরকার যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন। দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যও ভাবা হবে।



ক্রীড়া সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী।

জ্যোতি বসু।

খেলার কথা বিদেশে

ফুটবল তারকার জরিমানা

ইটালীর বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পাওলো রোসী সম্প্রতি প্রায় ১৫০০ টাকা জরিমানা দিয়েছেন। প্রেস রিপোর্টারদের কাছে দলের ম্যানেজার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় তাঁকে এই জরিমানা দিতে হয়। পেরুগিয়া বনাম নেপল্‌স দলের খেলা আরম্ভের পূর্বে পেরুগিয়া দলের এই টপ স্কোরার বলেন "জিওরজিও ভিতালীর মাথাটাই বড় কিন্তু বুদ্ধি কিছু আছে বলে মনে হয় না।" এই উক্তির জন্য তাঁর জরিমানা হয়।

ইউরোপে দল বদল

১৯৭৯-৮০ ফুটবল সীজন শেষ হতে এখনও প্রায় তিন চার মাস বাকী। এখন থেকেই আগামী বছরের দল তৈরীর জন্য সকলে উঠে পড়ে লেগেছে। বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলার ও তৎসহ ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক কেভিন কীগানকে ইংল্যাণ্ডের অনেকগুলি নামী দল পাবার জন্য চেষ্টা করছেন। ইটালীর দুটি দলও কীগান সম্বন্ধে ভীষণ আগ্রহী। বর্তমানে তিনি পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গার এস. ভি তে আছেন। এছাড়া অস্ট্রিয়ার জাতীয় দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড (বর্তমানে স্পেনের বার্সিলোনো এফ. সি.) হানস ক্র্যাংকলকে ইংল্যাণ্ডের দলগুলি পাবার জন্য খুব আগ্রহী। পশ্চিম জার্মানীর রাইট উইঙ্গার কার্ল হাইন্‌ৎও কে ইটালীর মিলান দল বিশ লক্ষ টাকা বেশী দিতে রাজী হয়েছে। আর্জেণ্টিনার ক্লদিও মারানগোনি এখন ইংল্যাণ্ডের সাণ্ডারল্যাণ্ড দলে খেলছেন সত্তর লক্ষ টাকার চুক্তিতে। আগামী দল বদলে এর পরিমান আরো বাড়বে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

আর্জেন্টিনার আগামী বিশ্বকাপ দল

লুই সীজার মিনোত্তি ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ দল এরই মধ্যে তৈরী করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন "আমরা বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাই যে ব্রাজিলের মত আর্জেন্টিনাও পর পর দুবার বিশ্বকাপ জয় করতে পারে এবং সেটা ঘটবে বিদেশের মাটিতে।"

বিশ্বকাপের সেই রেকর্ডধারী খেলোয়াড়

১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে ফ্রান্সের যুস্ত ফনতাঁ ১৩ গোল দিয়ে যে রেকর্ড করেছিলেন আজও তা অম্লান হয়ে রয়েছে। তিনি ফ্রান্সের জাতীয় দলের ম্যানেজার পদ থেকে অপসারিত হবার সাথে সাথে, মরোক্কো দল তাকে সসম্মানে নিজেদের জাতীয় দলের 'বস্‌' হিসেবে নিয়ে গেছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। মরোক্কো দলের ইচ্ছা ১৯৮২ সালে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা আর আরবের ফুটবলকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।

ফুটবল পত্রিকার ভোট

পূর্ব জার্মানীর বিখ্যাত ফুটবল পত্রিকার 'নয়ে ফুশবাল ভোখে" পাঠকদের ভোটে ইংল্যাণ্ড দল বিশ্বশ্রেষ্ঠ দলরূপে পরিগণিত হয়েছে। পাঠকদের মতামতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিম জার্মানী ও হল্যাণ্ড। সকলকে অবাক করে ইটালী সপ্তম স্থানে।

ইউরোপীয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ

আগামী জুন মাসে ইটালীতে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের চূড়ান্তপর্যায়ের খেলা শুরু হবে। সাতটি গ্রুপের যে চ্যাম্পিয়ান দলগুলি খেলায় যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা—ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, পশ্চিম জার্মানী এবং আয়োজনকারী দেশ ইটালী। এই চ্যাম্পিয়ানদের আবার দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপে আছে চেকোশ্লোভাকিয়া, পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড এবং গ্রীস দ্বিতীয় গ্রুপে আছে স্পেন, বেলজিয়াম, ইটালী এবং ইংল্যাণ্ড। আগামী ১১ই জুন রোম অলিম্পিক স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী খেলায় অংশ গ্রহণ করবে গতবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়ান চেকোশ্লোভাকিয়া খেলবে পশ্চিম জার্মানীর সাথে। এর এগারো দিন পর ২২শে জুন ঐ স্টেডিয়ামে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ানদলের সাক্ষাৎ হবে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান দল হিসেবে আখ্যা পাবার জন্য। লীগের অন্যান্য খেলাগুলি ইটালীর বিভিন্ন শহরে—মিলান, টুরিন, নেপলস এবং রোমে অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৮২তে স্পেনের বিশ্বকাপের দলগুলি

সম্প্রতি ১৯৮২'র বিশ্বকাপের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করবে ২৪টি দল। ছটি গ্রুপের প্রত্যেকটা থেকে দুটো করে, সাত নাম্বার গ্রুপের একটা ও আয়োজনকারী দেশ স্পেন এই ১৪টি দল। সাউথ আমেরিকা থেকে আর্জেন্টিনা (গতবারের বিজয়ী) এবং তিনটে গ্রুপ থেকে একটা করে মোট ৪টি দল। এশিয়া—ওসানিয়া থেকে দুটো, আফ্রিকা থেকে দুটো এবং নর্থ সেণ্ট্রাল আমেরিকা থেকে দুটো মোট ৬টি দল। এইভাবে ১৪+৪+৬ মোট ২৪টি দল।

ইউরোপ

গ্রুপ এক: পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড আলবানিয়া।

গ্রুপ দুই: হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, আয়ারল্যাণ্ড।

গ্রুপ তিন: চেকোশ্লোভাকিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ওয়েলস, তুর্কিস্থান, আইসল্যাণ্ড।

গ্রুপ চার: ইংল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যাণ্ড, রুমানিয়া, নরওয়ে।

গ্রুপ পাচ: ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ।

গ্রুপ ছয়: স্কটল্যাণ্ড, সুইডেন, পর্তুগাল, নর্থ আয়ারল্যাণ্ড।

গ্রুপ সাত: পোল্যাণ্ড, ইস্ট জার্মানী, মালটা।

এশিয়া—ওসানিয়া

গ্রুপ এক: ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজীল্যাণ্ড, তাইওয়ান।

গ্রুপ দুই: ইরাক, সিরিয়া, বাহারিন, দোহাকাতার, সৌদি—আরাবিয়া।

গ্রুপ তিন: কোয়েৎ, ইরাণ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, সাউথ কোরিয়া।

গ্রুপ চার: হংকং, মাকাও, চীন, নর্থ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর।

এই গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে সুপারলীগ হবে এবং প্রথম দুটি দলকে নেওয়া হবে।

সাউথ আমেরিকা

গ্রুপ এক: ব্রাজিল, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা।

গ্রুপ দুই: কলোম্বিয়া, পেরু, উরুগুয়ে।

গ্রুপ তিন: চিলি, ইকুয়েডর, পেরেগুয়ে।

নর্থ সেণ্ট্রাল আমেরিকা

নর্দান জোন: কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো।

সেণ্ট্রাল জোন: পানামা, কস্টারিকা, এল সালভাডর, গুয়েতমালা, হণ্ডুরু।

ক্যারাবিয়ান জোন: গ্রেল, গ্রেনাডা, গায়ানা, কিউবা, সুরিনাম, হাইতি, ত্রিনিদাদ, অ্যান্টিলে।

এই গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদেরও সুপারলীগ খেলতে হবে এবং প্রথম দুটি দলকে নেওয়া হবে।

আফ্রিকা

যে দলগুলি প্রথম রাউণ্ডে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে—সেনেগাল, মরোক্কো, জাহির, মোজাম্বিক, কেমারন, মালাওয়াই, গায়না, লেসাথো, টিউনিসিয়া, নাইজিরিয়া, লিবিয়া, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, নিজার, সোমালিয়া, সিরিয়া আলজেরিয়া, ঘানা, ইজিপ্ট, কেনিয়া, তানজানিয়া, উগাণ্ডা, মাডাগাসকার, লিওন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে যারা বাই পেয়েছে—সুদান, টোগো, সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, লিবেরিয়া।

নক-আউট প্রথায় খেলা হবার পর ফাইনালের দুটো দল স্পেনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

পশ্চিম জার্মানী থেকে: জি. সি. দাস.

খেলার কথা দেশে

বাংলা বনাম হায়দ্রাবাদ

রণজি ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের খেলা ইডেনে অনুষ্ঠিত হল ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে। বাংলা খেলল হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে। বাংলার অধিনায়ক রাজু মুখার্জী ও হায়দ্রাবাদের অধিনায়ক নরসিমা রাও টস করতে নেমে, হায়দ্রাবাদ টসে জিতেও বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠায়। বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠানোর যুক্তি হিসেবে হায়দ্রাবাদের অধিনায়ক বলেন "পিচে কতগুলি স্পট দেখে আশা করেছিলাম আমাদের বোলাররা সেটা কাজে লাগাতে পারবেন"। চারদিনের এই খেলায় প্রথম দিন মন মাতানো খেলা খেলেছেন বাংলার পলাশ নন্দী। ১১৬ রান করতে গিয়ে পলাশ সুন্দর কতগুলি 'পুল' ও 'গ্লান্স' করেন। ১০০ রান করতে সময় নিয়েছিলেন ১৫৬ মিনিট। মোট ২০৭ মিনিট উইকেটে দাঁড়িয়ে ২১৪ বল খেলে তিনি সংগ্রহ করেন ১১৬। হায়দ্রাবাদের বোলিং-এ উল্লেখ করার মত কিছু দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে শিবলাল ভাল বল করেন। ফিল্ডিং এ হায়দ্রাবাদ যতটা নিকৃষ্ট হতে পারে এদিন হয়েছিল, তিনটে ক্যাচ ফেলে ও বেশ কিছু বাউণ্ডারি হতে দিয়ে সেটা প্রমাণ করেছে। দিনের শেষে বাংলা ২৮১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরে। তখন বাংলার অধিনায়ক ব্যাট করছেন ৫২, উদয়ভানু ব্যানার্জী ২৮।

দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হতে পারে নি। তৃতীয় দিন মাঠে নেমে বাংলা আরো দু'উইকেট হারিয়ে ৩৩৩ রান করে। এই অবস্থায় হায়দ্রাবাদকে ব্যাট করতে সুযোগ দেয় বাংলা দল। হায়দ্রাবাদ দিনের শেষে ২৬ রানে ১ উইকেট হারিয়ে ঘরে ফেরে। এদিন প্রায় ১০৫ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।

চতুর্থ দিন, ২৭০ মিনিট সাথে কুড়ি ম্যানডেটরি ওভারের মধ্যে ৩০৮ তুলতে হবে এই অবস্থায় হায়দ্রাবাদ ব্যাট করতে নামে। কোন অবস্থাতেই নরসিমার দল সুবিধা করে উঠতে পারে নি। এক এক করে ৮৫ রানের মধ্যে পাঁচ উইকেট হারিয়ে অবশেষে অধিনায়ক সাথে অরশদ আয়ুবকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। কতগুলি দর্শনীয় 'ড্রাইভ' ও 'পুল' সহ নরসিমা ১০৭ রান করেন। এই রান সংগ্রহ করতে সময় নেন ২৮৫ মিনিট, ২২টা বল খেলে। যদিও নরসিমা ৫০ রানে একটা সুযোগ দোশীর বলে মিড- অনে দিয়েছিলেন কিন্তু পোরেল ব্যর্থ হন সেই ক্যাচ ধরতে। আয়ুব রনজি ট্রফিতে জীবনের প্রথম অর্ধশত রান করেন ১৫০ মিনিট সময়ে। প্রথম রান নেন প্রায় ৩০ মিনিট ব্যাট করবার পর। সারাদিনে হায়দ্রাবাদ ২৪৫ রান ৫ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করেন। দিলীপ দোশী ২, পোরেল ২ ও অলোক ১ উইকেট সংগ্রহ করেন। এই অবস্থায় খেলার প্রথম ইনিংসে মীমাংসা না হওয়ায় টস করে বাংলার অধিনায়ক ম্যাচ জিতে নেন।

বাংলা এবার কো: ফাইনাল খেলা খেলবে (১৪-১৭ মার্চ) দিল্লীর সাথে। দিল্লী দলের অধিনায়ক হয়ে আসছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিশেষ সিং বেদী।

নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তর প্রদেশ বনাম হরিয়ানা

কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ এই দু দলের মধ্যে শুরু হয় ২৯শে ফেব্রুয়ারী।

প্রথমদিন উত্তর প্রদেশ দলের অধিনায়ক বিজয় চোপরা (৭২) সাথে অনিল মাথুর (৬৫) দু জনেই মারমুখী ব্যাট করেন। হরিয়ানা দলের কোন বোলারই এদিন সুবিধা করতে পারেন নি।

দিনের শেষে রাকেশ জলি ৩৮ রানে ২ / কপিলদেব ৫০ রানে ১/ রাজিন্দার গোয়েল ৬৩ রানে ১ উইকেট সংগ্রহ করেন। ১৭৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে উত্তর প্রদেশ প্রথম দিনের খেলা শেষ করে।

দ্বিতীয় দিন উত্তর প্রদেশ ২৬৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। হরিয়ানা দলের ব্যাট করতে আসে ওপেনার সরবজিৎ সিং ও সেলিম আহমেদ লানচের ২০ মিনিট আগে। দিনের শেষে ১৯০ রান করে ৬ উইকেট হারিয়ে। অশোক মালহোত্রা সর্বোচ্চ রান ৭০ করেন। দর্শকের মন ভরাতে পারেন নি হরিয়ানা অধিনায়ক কপিল দেব। মাত্র ৭ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। উত্তর প্রদেশের নির্ভরযোগ্য স্পিনার রাজিন্দার সিং হানস ৭৬ রানে ৪ উইকেট নিজের নামে তুলে নেন।

তৃতীয় দিন হরিয়ানা সুবিধা করতে পারে নি প্রথম ইনিংসে। মাত্র ৩৬ রান যোগ করে ২২৬ রানে সব উইকেট হারায়। এদিন আরো ১ উইকেট হারায়। হানস এদিন আরো ১ উইকেট সংগ্রহ করেন। ৩৯ রানে এগিয়ে থাকা উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১১৭ রানে সমস্ত উইকেট হরিয়ানার হাতে তুলে দেয়। অধিনায়ক কপিলদেব নিজেকে যেন হঠাৎ ফিরে পান— এক নাগাড়ে ২৭ ওভার বল করে ৫ উইকেট সংগ্রহ করেন মাত্র ৫৯ রানের বিনিময়ে। বাকি ৩ রাজিন্দার গোয়েলের ও ১ জলির নামের পাশে লেখা হয়ে যায়। এদিন গ্রীন পার্কে যেন প্রাণ ফিরে এসেছিল। হরিয়ানা আবার দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে পড়ে মাত্র দু উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ৭১। চতুর্থ দিনের সারাদিন খেলা বাকি জিততে হলে সংগ্রহ করতে হবে ৮৬ রান এই অবস্থায় তৃতীয় দিন খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে হরিয়ানা আলোর অভাবে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসে।

চতুর্থ দিন খেলতে নেমে ৯৯ মিনিটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় হরিয়ানা দল মাত্র ১ উইকেট আরো হারিয়ে।

হরিয়ানা এই খেলায় জয়লাভ করে বাঙ্গালোরে কো: ফাইনালে সাক্ষাৎ করছে কর্ণাটক দলের সাথে ১৪ই মার্চ থেকে।

কানপুরের সংবাদদাতা

রোভার্স কাপ

ওরকে—২ বনাম সেঞ্চুরি রেয়ন—০

জে. সি. টি—৩ বনাম সি. আর. পি. এফ—১

জে. সি. টি—৩ বনাম ওরকে—০

মফৎলাল—১ বনাম পাঞ্জাব পুলিশ—০

ডেম্পো—১ বনাম প্রিমিয়ার টায়ার—০

ডেম্পো—১ বনাম মফৎলাল—০

ডেম্পো ২ বনাম জে. সি. টি

রোভার্স ফাইনালে ডেম্পো হারাল জে. সি. টি-কে। সারাটা খেলায় ডেম্পোর আধিপত্য সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই। এই নিয়ে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের তৃতীয় বার রোভার্স কাপ জয়। প্রথম তারা রোভার্স কাপ ঘরে তুলে ছিল মাত্র দু'বছর আগে ১৯৭৪ সালে। তারপর ১৯৭৯তে।

দুটি গোলই করেন ডেম্পো দলের স্ট্রাইকার 'দিওনিসিও ত্রিনিদাদ'। যদিও বেশ কয়েকটি গোল আরো নিজের নামের পাশে জুড়ে নিতে পারতেন যদি ভুল মারের সংখ্যাটা কমাতে পারতেন। ডেম্পো এই ফলাফলকে আরো বাড়িয়ে যদি রোভার্স কাপ ঘরে তুলত তবে অবাক হবার কিছু ছিল না। সারাটা সময় ডেম্পো স্ট্রাইকারদের ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে বিপক্ষ দলের সীমানার মধ্যে। যদিও জে. সি. টি দলের ইন্দার সিং, চেষ্টা করেছিলেন, খেলার ফলাফল যাতে নিজেদের দিকে আনা যায়। কিন্তু ডেম্পোর দুই ডিফেণ্ডার নিকোলাস এবং মাহেশ এই জে. সি. টি দলের পেস-মেকার কে একদম সুবিধে করতে দেননি। সারাটা সময় চোখে চোখে রেখেছেন। খেলার শুরুতেই ডেম্পোর ফরোয়ার্ড এ্যালেক্স বল বাড়িয়ে দেন গোলের মুখে কিন্তু লিকম্যান বাবু'র তীব্র সট গোল পোস্ট ছুঁয়ে চলে যায়। অবশ্য গোল পাবার জন্য বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি ডেম্পো দলকে। পনের মিনিট খেলার পর এ্যালেক্স বল বাড়িয়ে দেন আরমানডো'র উদ্দেশ্যে কিন্তু বল ওর পা ছুঁয়ে চলে যায় গোলকিপারের সামনে অরক্ষিত দাঁড়িয়ে থাকা দিওনিসিওর কাছে—ওর এতটুকু ভুল হয়নি সুরজিতকে ফাঁকি দিয়ে জালে পাঠাতে।

খেলা শেষ হবার মিনিট দশেক আগে থেকে জে. সি. টি'র খেলোয়াড়দের ডেম্পোর গোল এরিয়াতে দেখা যায়। সেই সময় জে. সি. টি এমন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে পাঁচ মিনিটে তিনটে ফ্ল্যাগ-কিক পায়, যদিও একটিরও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

শেষ বাঁশি বাজবার দু'মিনিট আগে দিওনিসিও নিজের দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন।

বোম্বাই-য়ের সংবাদদাতা

যখন কেউ চিনতনা

রঞ্জিত মুখার্জী

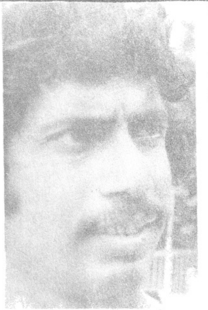
আমি রহরার লোক। ছোটবেলা থেকেই সেখানে আছি। আমাদের বাড়ীতে বাবা-কাকা কখনো চাইতেন না যে, আমি ফুটবল খেলি। তাঁরা খেলাধূলার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কাকাতো খেলতে গিয়েছি শুনলে ভীষণ মার দিতেন। তাই চুরি করে আমাকে ফুটবল খেলতে হত। রহরাতে একটা দোকানে আমার বোঝাপরা ছিল। স্কুল ছুটির পর যেখানে বই খাতা রেখে খেলতে যেতাম। আগে থেকেই প্যাণ্ট-জামা এক বন্ধুর কাছে দিয়ে রাখতাম। এ-সব ঘটনা যখন বলছি তখন আমি আওার হাইটে দারুন খেলছি। রোজই দু তিনটে করে গোল করছি—ব্যস ঐ পর্যন্তই। আমার ধারনা ছিলনা যে ফুটবল খেলে এর চাইতে বেশি কিছু করা যায়। তাই যেটুকু সময় বাবা-কাকার চোখে ধূলো দিয়ে খেলা যেত ঠিক সেইটুকুই খেলতাম।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মিশন মাঠে ছুটে যেতাম। পরিমল দত্ত (রাজস্থানে খেলতেন) প্র্যাকটিস করতেন। আমিও তার সঙ্গে প্র্যাকটিস করতাম। তবে বল নিয়ে নয়। দৌড়-ঝাপ এই সবই করতাম। বাবা কাকা টের পাবার আগেই বাড়ীতে এসে হাত মুখ ধুয়ে লক্ষী ছেলেটি সেজে বই নিয়ে বসতাম। তারপর স্নান-খাওয়া সেরে স্কুল। তবে বিকেলে বল না হলে চলতনা।

আমার স্কুল-জীবনের পুরো সময়টাই কেটেছে রহরা রামকৃষ্ণ মিশনে। মিশনের কড়া আইনে লেখা-পড়াতে ফাঁকি দেওয়া যেতনা। বাড়ী এবং স্কুলের কড়া শাসন এবং কঠোর আইনে আমার বেশ লাভ হয়েছিল। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিলাম। আগেই বলেছি খেলার চেয়ে পড়াকে আমি স্থান দিয়েছিলাম বেশি।

মিশনে কিন্তু খুব ভালো টীম ছিল। মিশন মাঠে বেশ বড়-বড় খেলা হত। যে কোনো ফুটবলার খেলে প্রথমে স্কুলে, পরে জেলার মাঠে। আণ্ডার-হাইটে খেললেও স্কুল মাঠে আমি খেলতে পারিনি। সুযোগ যে পাইনি তা নয়। আসলে আমার বুট ছিলনা।

ফুটবলের প্রতি আমার ঝোঁক আসে জংলা দা (পরিমল দে) কে দেখার পর থেকে। জংলা দা আমাদের খড়দহের লোক। মিশন মাঠে জেলা-লীগে ওর পাড়ার ক্লাব কুলিন পাড়ার হয়ে মিশন মাঠে খেলতে আসতেন। একদিন তাদের সঙ্গে শ্যামনগর যুগের প্রতীকের খেলা ছিল ঐ মিশন মাঠে। যুগের প্রতীক টীমে তখন কেস্ট-পাল খেলতেন। কেস্ট-পাল দারুন হেড করে গোল করতে পারতেন। সেদিন তিনি একটা উচুর বলে যেভাবে ফ্লাই করে হেড করেছিলেন



তা আমি আজও ভূলিনি। সেটা থেকে গোলও হয়েছিল। গোলটা না ভোলার পিছনে আরও একটা মজার ঘটনা জড়িয়ে আছে। আমি বরাবরই হেডটা ভালো করতাম। আণ্ডার-হাইটে বেশিরভাগ গোলই পেয়েছি হেড থেকে, কেস্ট-পালের ঐ হেড দেখে আমারও রোখ চাপল যে আমিও ঐ ভাবে 'ফ্লাই' করে হেড দেব। বাড়ীতে যখন বাবা কাকা থাকতেন না তখন দরজার দুটো খিল দু-পাশে দাঁড় করিয়ে গোলপোস্ট বানাতাম। অনেকগুলো কাগজ-পাকিয়ে বল বানিয়ে হেড প্র্যাকটিস করতাম। সেদিনও ঠিক সেই ভাবে কেস্ট পালের মতো হেড করতে গেলাম। একই সঙ্গে হেডও করলাম মাথাটাও ফাটালাম। হেডের পর টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালে গিয়ে পরে-ছিলাম। আর যাই কোথায়! ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল। বেশ কটা সেলাই পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

জংলা দা কে দেখে ফুটবলকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। তাঁর জনপ্রিয়তা আমাকে নতুন পথ দেখিয়েছি। যেখানেই জংলা দা যেতেন দেখতাম তাঁর পিছন পিছন একদল ফুটবল পাগল মানুষ ছুটছে। তাই দেখে আমিও ঠিক করলাম যে শুধু পাড়াতে সময় কাটাতে বা আনন্দ করতে নয়।

সত্যিকারের ফুটবল খেলতে হবে। জংলা-দার খেলা যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই ভোলেন নি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তিনি কী সুন্দর দু পায়ে বল নাচাতেন।

ঐটা দেখে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রোজ কম্পিটিশন হয়। কে কতবার পায়ে বা হাটুতে বল নাচাতে পারবে। ত্রিশবার পারলেই পাশ করা যাবে। তারপর যে যত বেশি পারবে সে ততো নম্বর পাবে।

ছোটবেলা থেকে মোহনবাগান সাপোর্টার ছিলাম। তবে জংলাদাকে দেখার পর মতও বদল করেছি।

ময়দানে ভালো খেলা পড়লে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে যেতাম। ১৯৬৭ সালে মোহন বাগান টীম দারুন শক্তিশালী। কোন এক শনিবার ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা। প্রদীপ দা, কাজলদা তখন রেল টীমে। যে খেলায় ইস্টার্ণ রেল দু-গোলে জিতেছিল। খেলার আগে আমি একটা দুষ্টুমি করতে গিয়ে সাজা পেয়েছিলাম। পঞ্চাশের টিকিট কেটে বেড়া টপকে উত্তর দিকে এক টাকার গ্যালারীর দিকে যেতেই একজন পুলিশ আমাকে সমুচিত সাজা দিতে ভূল করেনি।

১৯৬৮তে আমি হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছি। রেজাল্ট বেরোয় নি। টানা বিশ্রাম। খেলা দেখা। খেলা—এই ছিল আমার কাজ। জেলালীগে সোদপুর মাঠে আমার ক্লাব রহরা সঙ্ঘের খেলা পড়েছে। অমৃত চক্রবর্তী তখন আমাদের টীমে খেলছেন। আমাদের টীমে ষোল জন খেলোয়াড় ছিল না। তাই ষোল-জনের মধ্যে আমার নামটা ঢোকানো ছিল। হাফটাইম হয়ে গেছে। কিছুতেই গোল হচ্ছেনা। সবাই তখন আমাকে নামতে বললেন। কিন্তু আমার তো বুট ছিল না। পাড়ার কাকা (গুল-দা) একজোড়া বুট এনে দিলেন তাতে আবার লেস্ নেই। দড়ি জোগাড় করে এনে সেই বুট বেধে নেমে পড়লাম। বিশ্বাস করুন দু-টো গোল করে ফেললাম। আজও দেখা হলে গুল-দা সে কথা মনে করিয়ে দেন।

এরপর কলেজ জীবন শুরু হল মৌলানা আজাদ কলেজে। এতোদিনে একজোড়া বুট কিনে ফেলেছি। কলেজ টীমে ইলিয়ট শীল্ডে প্রথম খেলবার সুযোগ পেলাম ফকিরচাঁদ কলেজের বিপক্ষে। প্রথম নেমেই ছ-টা গোল করলাম। আস্তে আস্তে ফুটবল আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। বি এ পাশ করার পর এই নিয়ে আরও মেতে গেলাম।

১৯৭০ সালে বউবাজার টীমে প্রায় রোজই খেললাম। ১৯৭১-এ কালিদাস মুখার্জী আমাকে বাটা টীমে নিয়ে আসে। বাটার হয়ে প্রথম বারই মোহনবাগানকে লীগে গোল করলাম। বেশ মনে পড়ছে বাবা তখনও ফুটবলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। রোভার্সে খেলতে অনুমতি দেননি। ১৯৭২ সালে বাটাতেই ছিলাম। আবার মোহনবাগানকে দু-গোল করলাম। তারপর চলে এলাম খিদিরপুরে। খিদিরপুরে এসে ১৯৭৩ এ ন্যাশন্যাল খেললাম। আরও এক বছর সেখানে কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গলে — তারপর। তারপর, সব ঘটনাই আপনারা জানেন।

খেলার কথার পক্ষ হইতে শ্রীবিপ্লব দাশগুপ্ত, ৩১এ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত এবং
ন্যাশানাল আর্ট প্রেস, ১৫৭/এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

আমরাই প্রথম



আট থেকে আশি কথাটা বড় পুরনো। তাই লিখছি বুঝতে পারার বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত সকলেই ভালবাসে—কি?

সকলেই হৈ, হৈ করে উত্তর দেবেন —কমিকস! কমিকস!! কমিকস!!!- কমিকস!!!!

আর সেই কমিকসের বিষয় যদি, আমাদের সব সময়ের আলোচনার বিষয় হয়—তবে তো কথা-ই নেই।

যে খেলাকে নিয়ে সারা বছর ঘরে-বাইরে, হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, অফিসে-আদালতে—আলোচনা, উত্তেজনা হয়। সেই খেলাকে নিয়ে আমাদের কমিকস।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত সমস্ত লীগের সাক্ষাৎকারগুলি আমরা ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরছি—কমিকসে।

আমাদের দেশের খেলা নিয়ে এই প্রথম একটি মহৎ প্রচেষ্টা। লক্ষ্য রাখুন 'খেলার কথা'তে। খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন।



gistration No. RN/32903/78 KHELAR KATHA 16th March 1980 WB/EC—188 Rs. 1.40

